নানা রঙের আলো

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
রেখা বিশ্বাস
'মাঙ্গলিক'
উত্তরায়ণ | মধ্যমগ্রাম
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
দীননাথ সেন।

মুদ্রক ঃ
পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

কালীকিংকরের ডায়েরী থেকে

মানুষের কথা আমি অনেক ভাবিয়াছি। মানুষের কথা, তাহার সুখদুঃখের কথা, তাহার নির্বুদ্ধিতা ও বুদ্ধিমত্তার কথা, তাহার পাপ ও পুণ্যের কথা। ভাবিয়া কিছু সুনির্দিষ্টভাবে ঠাহর পাই না। মানুষ এক অবিনাশী শক্তি। বারবার তাহার পতন ঘটে, আবার সে উঠিয়া দাঁড়ায়। কে কোথায় মরিল, কে কোথায় পড়িল তাহা বড় কথা নহে, সমষ্টিগতভাবে যে মানুষ একটা কিছুর দিকে আগু হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই লক্ষ্যবস্তু কী তাহা কি সে জানে ? মানুষকে এই প্রশ্ন করিলে বিবিধ উত্তর মিলিবে। হয়তো সব উত্তরই ঠিক, হয়তো সবই বেঠিক, আবার হয়তো আংশিকভাবে কিছু ঠিক এবং কিছু বেঠিক। মানুষের সুখদুঃখের হিসাবেও অনেক গরমিল আছে। আমি তো দেখি পৃথিবীর একটি মানুষও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যে থাকে না। যে মানুষটার পেটে খাদ্য নাই, পরনে বস্ত্র নাই, মাথার উপর আশ্রয় নাই, প্রিয়-পরিজন নাই, সেও সর্বদা দুঃখে থাকে না। সে হয়তো জ্যোৎস্না দেখিয়া হাসে, সুন্দরী রমণী দেখিলে মুগ্ধ হয়, গান শুনিয়া গুনগুন করিয়া দু-এক কলি গাহিয়া উঠে, বৃষ্টিতে সে হয়তো খুশি হয়, গোলাপ দেখিলে বোধহয় তাহার হৃদয় ফুল্ল হইয়া উঠে। দুঃখকে সর্বদা ধরিয়া রাখিবার মতো শক্ত মানসিকতা অধিকাংশ মনুষ্যেরই নাই। মানুষের সুখের ধারণাও আবিল। যখন সুখে থাকে তখন বুঝিতে পারে না যে, সে সুখে আছে। যখন দুঃখ আসিয়া হঠাৎ থাবা বসায় তখন সে ভাবিয়া স্থির করে যে, আহা, অমুক সময়টা বড় সুখের ছিল। দাঁতের ব্যথায় কাতর মানুষ ভাবে, আহা, ব্যথার আগে কতই না সুখে ছিলাম।

আখ্যানের প্রথমেই এক বক্তৃতা জুড়িয়া দিয়াছি। বলিব তো নিজের কথা। সে কথা এমন কিছু দার্শনিক কথাও নহে। তবু ভূমিকাটার আবশ্যক ছিল, ইহার দ্বারা নিজেকে জরিপ করিব বলিয়াই।

মাতামহ আমার নাম রাখিয়াছিলেন কালীকিংকর। অর্থাৎ কালীর দাস। আমার মাতুলালয় হুগলি জেলার ঘোলা নামক গ্রামে। বাড়িটি প্রাচীন এবং বিশাল। তাহারই একদিকে ভগ্নপ্রায় একটি কালীমন্দির ছিল। দেউল ভগ্ন হইলেও দেবী পূজা পাইতেন। বহু বছর ধরিয়াই পাইয়া আসিতেছেন। জাগ্রতা দেবী হিসাবে আমার মাতুলালয়ের কালীর বিশেষ খ্যাতি ছিল। গ্রামান্তর হইতে লোক মানসিক করিতে আসিত। সেবাইত হিসাবে আমার মাতামহের এই মন্দির হইতে বিলক্ষণ আয় হইত। তিনি যে ভগ্ন দেউল সংস্কার করান নাই তাহার কারণ শরিকী বিবাদ। এই বিবাদও বেশ প্রাচীন এবং ঘটনাবহুল।

বলা বাহুল্য আমার মাতুলালয় ধনী। কিন্তু সে আমলের ধনীরা এক পুরুষে ধনসঞ্চয় করিলে উত্তরপুরুষেরা আর তাহা রক্ষা করিতে পারিত না, ধনবৃদ্ধি তো দূরের কথা। আদতে বাঙালীমাত্রই এ ব্যাপারে দূরদৃষ্টিবর্জিত। আমার মাতামহ সেই দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তবে নাই-নাই করিয়াও যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাতে চলিয়া যাইত। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার ফুটা দিয়া দারিদ্র্যের জল ঢুকিতে শুরু করিয়াছে। নৌকা বুঝি আর বাঁচে না।

আমার পিতার সহিত মাতার যখন বিবাহ হয় তখন আমার মাতামহ সদ্য একটি বড় মামলায় জিতিয়াছেন। সেই মামলায় জিতিয়া তাহার বিশেষ আর্থিক লাভ হয় নাই, তবে মর্যাদা রক্ষা হইয়াছে। ইহাতেই তিনি মশগুল। সুতরাং বিবাহে বিশেষ ধূম হইল। প্রচুর অর্থব্যয় করিতে গিয়া মাতামহ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া কর্জ করিলেন।

আমার পিতা ধনীর সন্তান নহেন। লোভী বা অসৎ নহেন। সদুপায়ে উপার্জনের চেষ্টা করিতেন। তিনি অপব্যয়কে বড় ঘৃণা করিতেন। সম্ভবত শ্বশুর মহাশয়ের হাবভাব তাঁহার ভাল লাগে নাই।

আমার পিতার সহিত মাতামহের চরিত্রগত পার্থক্য ছাড়াও আর একটি বিষয় লইয়া তাঁহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। মাতামহ আমাব পিতাকে ঘরজামাই করিতে চাহিয়াছিলেন। এবং ইহা লইয়া বিশেষ জেদাজেদিও করিতে লাগিলেন। আমার পিতা স্বাধীনচেতা পুরুষ। পরের গোলামী করিবেন না বলিয়াই তিনি পাটের ব্যবসায় নামিয়াছিলেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতেন। পূর্ববঙ্গ হইতে পাটে নৌকা বোঝাই করিয়া কলিকাতায় আসিয়া চটকলে পাট বিক্রয় করিতেন। আয় ঈর্ষণীয় ছিল না, কিন্তু একরোখা মানুষটি ব্যবসা ছাড়িতে বা শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইতে কোনোক্রমেই রাজি হইলেন না।

আমার পিতার চালচুলা উচ্চমানের ছিল না। তিনি পুরোহিত-পুত্র। দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা তিনি বাল্য হইতেই ভোগ করিয়াছেন। মাতামহ ভাবিয়াছিলেন দরিদ্র ও

সুলক্ষণযুক্ত এই জামাইটিকে নিজের ঘরে আনিতে তাঁহার বেগ পাইতে হইবে না। অথচ ঘরজামাই করা যে নিতান্ত আবশ্যক ছিল এমনও নহে। মাতামহের তিনটি বয়োপ্রাপ্ত পুত্র ছিল, বড় আব একটি কন্যাও ছিল। স্বীয় স্বভাবদোষে তিনি পুত্র-কন্যাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল অন্য পুত্রকন্যাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠা কন্যা—অর্থাৎ আমার মাকে সব বিষয়-সম্পত্তি দিয়া যাইবেন। যদিও বিষয়-সম্পত্তি তখন তলানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, পাঁচ-সাতটি মামলা ঝুলিতেছে এবং রোজ মামাদের সহিত মাতামহের বিবাদ বাঁধিতেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমার পিতাকে সহায় পাইলে মাতামহের কিছু সুবিধা হইতে পারিত বোধহয়। কিন্তু পিতা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় মাতামহ সাফ বলিলেন, তা হলে মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে যেতে দেবো না।

পিতা বিনয়ের সহিত বলিলেন, যেমন আপনার ইচ্ছা।

পিতা আমার মাতাকে একপ্রকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াই নিজের কাজে ফিরিয়া গেলেন।

আমার জন্ম এই তীব্র অশান্তির মধ্যে। জ্ঞানোন্মেষের পর হইতেই আমি আমার মাকে কেবলই চোখের জল ফেলিতে দেখিতাম। মাঝে মাঝে তিনি পিতাকে চিঠি লিখিতেন। কিন্তু সর্বদা জবাব পাইতেন না, কাবণ পিতা তিন-চারি মাস কাল পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে একাদিক্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ব্যবসা দাঁড় করাইবার জন্য তাঁহার নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত মাথায় উঠিয়াছিল।

আমি মাতুলালয়ে বড় হইতেছি। ঘোলা গ্রামটি প্রাচীন। স্নিগ্ধ প্রকৃতির শ্রীসম্পন্ন। বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। পাকা বাড়িই অধিক। স্কুল, বাজার, দোকানপাট সবই আছে। মাতামহ আমাকে সর্বত্রই লইয়া যাইতেন। আমি তাঁহার অত্যধিক প্রিয় নাতি ছিলাম। আমার তিন মাতুলেরই অনেকগুলি করিয়া পুত্রকন্যা ছিল। অতগুলি নাতি-নাতনীর মধ্যে মাতামহ আমাকেই বাছিয়া লইযাছিলেন। সম্ভবত আমার পিতার অভাব পূরণ করিতেই এই পক্ষপাত।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগত কালীর মন্দিরখানি। কতকাল আগে তাহা নির্মিত হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে ইহা যে এক মহান শিল্পীর নির্মাণ তাহা সেই বাল্যকালেও বুঝিতে কষ্ট হইত না। মন্দিরগাত্রে নানারূপ কারুকার্য ছিল। মেঝেটি ছিল শ্বেতপাথরের। মন্দিরের চারিধাবে প্রচুর গাছপালা থাকায় একটি শান্ত ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ সর্বদা ঘিরিয়া থাকিত। এককালে এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একাধিক নরবলিও হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি। তবে নববলি অপ্রচলিত হইলেও পশুবলি কম হইত না। বলি দেখিয়া দেখিযা আমাব বক্তপ্রবাহ সম্পর্কে আতঙ্ক

বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমার তান্ত্রিক দাদামহাশয় দিন ও রাত্রির অনেকটা সময় এই মন্দিরে কাটাইতেন। তিনি মারণ উচাটন জানিতেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তাহাতে কাজ হইত কিনা তাহা আমি সঠিক জানি না। তবে দাদামহাশয় আমার চক্ষুর সম্মুখেই নগদ টাকা ও সোনাদানা ইত্যাদি প্রণামী ও দক্ষিণা পাইতেন।

কিন্তু আয় ভাল হইলে কী হয়, লোকটির খরচের হাতও ছিল সাঙ্ঘাতিক। সুতরাং আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা হইত না। ব্যয়ই হইয়া দাঁড়াইল তাঁহার নিয়তি। লোকে তাঁহাকে খানিকটা ভয়-ভক্তি করিত বলিয়া উত্তমর্ণরা সহজে তাঁহাকে ঘাটাইত না। কিন্তু শুনা যাইতেছিল আমার মায়ের বিবাহ উপলক্ষে তিনি এত বেশি ঋণ করিয়াছিলেন যাহা শোধ করা একপ্রকার অসম্ভব। পাওনাদারেরা একযোগে মামলা ঠুকিয়া দিল।

বাপের বাড়িতে আমার মাতার গঞ্জনার অবধি ছিল না। কারণ দাদামহাশয়ের বিপাকের দরুন তাঁহার বিবাহই প্রকারান্তরে দায়ী। দিদিমা প্রায়ই আক্রোশবশে বলিতেন, রাক্ষুসী, তোর জন্যই সংসার ভেসে গেল। তুই মরিস না কেন ?

বলা বাহুল্য আমার মাতুল মাতুলানীবাও মায়ের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই অসহায়, শিক্ষা দীক্ষাহীনা, পরনির্ভরশীলা রমণী—অর্থাৎ আমার জননীকে দেখিয়াই আমি নারীমুক্তির প্রকট প্রয়োজন প্রথম উপলব্ধি করি। কিংবা সেটা ঠিক উপলব্ধি নয়, একটা অস্ফুট বোধমাত্র। আজকাল যখন নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা শুনি তখন আমার অসহায় জননীর কথাই সর্বদা মনে পড়ে। এমন শিক্ষা বা যোগ্যতা নাই যাহাব দ্বাবা স্বনির্ভর হইতে পারেন। স্বাধীন চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তি নাই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার মতো বুদ্ধি বা সাহস নাই। নিজের অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা নাই। তাঁহার বা মাতুলালয়ের দুর্ভাগ্যের দরুন তাঁহার নিজস্ব কোনো অবদান যে নাই তাহা জোর গলায় বলিবাব মতো যথেষ্ট চারিত্রিক জোরের অভাব। সব মিলিয়া মায়ের অবস্থা অতীব করুণ। তাহা আরো করুণতর হইয়াছিল, কারণ, মাতার নিজেরও ধারণা হইয়াছিল যে তিনি মূর্তিমতী অলক্ষ্মী।

মাতামহ অবশ্য এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেন না। মামলা-মোকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত। দ্বিপ্রহরে মৎস্যের মুড়া এবং রাত্রে ক্ষীরের বাটি অব্যাহত ছিল। আমি নিজের চোখে দেখিযাছি, তিনি পুত্রদেব শাপশাপান্ত করিতে করিতে গোঁফ ভিজাইয়া ক্ষীরের বাটিতে চুমুক দিতেছেন।

মাতুলালয়ে মাতামহের মতো আমাকে আর কেহ ভালবাসিত না বটে কিন্তু অকারণ গঞ্জনাও দিত না। আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে আমিও বাড়িয়া উঠিতেছিলাম মাত্র। তবে আমার সেইসব ভাইবোন আমাকে কিছুটা ঈর্ষা

করিত। আমি তাহাদের সমবেত আক্রোশের মুখে কয়েকবার পড়িয়াছি। আমি ও আমার জননী যে এ বাড়িতে অনভিপ্রেত তাহা সেই বাল্যকালেও কতক বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, বিবাগী পিতা একদিন আসিয়া হাজির হইবেনই এবং আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে। তাই আমি তাহাদের াসাইতাম, দেখিস একদিন বাবা অনেক টাকা নিয়ে আসবে আর আমাদের নিয়ে াবে। তোদের পচা বাড়িতে থাকব নাকি তখন?

এই সময়ে, অর্থাৎ আমার আট-নয় বছর বয়সে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা লি। একটি বিড়াল আমাদের বাড়ির কোথাও বাচ্চা পাড়িয়াছিল। কিন্তু শিয়াল কুকুরের উৎপাতে বাচ্চাগুলির নিরাপত্তা ছিল না। দুইটি বাচ্চা বাঘা কুকুরের াবা এবং কামড়ে মরিল। অবশেষে ধাড়ি বিড়ালটা অবশিষ্ট বাচ্চাটি লইয়া আমাদের ঘরে থানা গাড়িল। খাটের তলার নানা জিনিসের ফাঁক-ফোঁকরের মধ্যে াচ্চাটিকে লুকাইয়া রাখিয়া বিড়ালটি রোঁদে বাহির হইত।

কেন জানি না, বাল্যকাল হইতেই বিড়াল আমি পছন্দ করি না। ইহারা জাত বিশ্বাসঘাতক। শত পোষ মানিলেও পাত হইতে মাছ চুরি করিয়া পলায়। আলস্যে কাল কাটায়। এবং মানুষের তেমন উপকারেও লাগে না। ইঁদুর মারে লিয়া একটা লোকপ্রচলিত ধারণা আছে, কিন্তু সেটাও নির্ভর করে বিড়ালের ইচ্ছার উপর। গৃহস্থের উপকারের জন্য ইঁদুর মারিতে তাহাদের বড় বহিয়াই গয়াছে। বরং গৃহস্থের লেপ তোষক বালিশের মধ্যে ঢুকিয়া অকালনিদ্রাই তাহাদের বেশী প্রিয়।

বিড়ালের বাচ্চাটি যে খুব উৎপাত করিত তাহা নহে। সে লুকাইয়াই থাকিত। ঘরে কেহ না থাকিলে বাহির হইয়া আসিয়া একা একা একটু খেলা করিত। লোক দেখিলেই গিয়া খাটের তলায় লুকাইত।

সেই বিড়ালশিশুর সুন্দর ফুটফুটে মুখখানি আজিও আমার চোখে ভাসে। খাটের তলা হইতে মাঝে মাঝে সতর্কভাবে মুখখানা বাহির করিয়া সভয়ে চাহিয়া চারিদিক দেখিত। তাহার মলমূত্র এবং বমি পরিষ্কার করিতে হইত আমার জননীকেই। লাঠি লইয়া বহুবার তাহাকে তাড়া করিয়াছি। কিন্তু সে খাটের নিচে টাংক-বাক্স, বয়ম, ধামা, ঝুড়ি ইত্যাদির আড়ালে এমনভাবে আত্মগোপন করিত যে, ঘর হইতে তাহাকে তাড়ানো অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কিন্তু একদিন তাহাকে বাগে পাইলাম। সন্ধ্যাবেলা ফাঁকা ঘরে বাচ্চাটি আপন মনে বাতাসে থাবা তুলিয়া খেলিতেছিল। আমার আগমন টের পায় নাই। আমি লাঠি লইয়া প্রথমেই সজোরে এক ঘা বসাইয়া তাহাকে কাবু করিলাম। সে প্রাণান্তকর এক আর্তনাদ করিতে করিতে আবার খাটের তলার দিকে ছুটিল।

আমি লাঠি দিয়াই তাহাকে টানিয়া আনিলাম। তাহার পর কতক হকিস্টিকের মতো লাঠির সাহায্যে ঠেলিয়া গুঁতাইয়া তাহাকে চৌকাঠের ওপারে লইয়া গেলাম। সে চিত উপুড় হইতে হইতে এবং চিৎকার করিতে করিতে বারান্দায় পড়িয়া দুর্বল পায়ে দৌড়িয়া অন্ধকারে নামিয়া গেল।

আমার জননী বোধহয় দূরে ছিলেন না। তিনি চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, ওরে, ও যে বড্ড বাচ্চা, এরকম করিসনি। মরে যাবে।

আমি কর্ণপাত করি নাই। কী এক খুনী জেদ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল কে জানে।

জননী ছুটিয়া আসিয়া আমার গালে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, কী সর্বনাশ করলি বল তো! ষষ্ঠীর বাহন, যদি মরে যায়? ওমা, আমার কী হবে!

আমিও কেমন যেন বুঝিতেছিলাম সুন্দর বিড়ালশিশুটিকে ওরকম তাড়না করা আমার উচিত কাজ হয় নাই। তবু আমি তারস্বরে আমার কার্যের সপক্ষে অনেক যুক্তি প্রয়োগ করিলাম। বিড়াল চোর, অলস, ঘর নোংরা করে ইত্যাদি।

পরদিন সকালে বাগানের গন্ধরাজ গাছটির তলায় বাচ্চাটির মৃতদেহ পাওয়া গেল। পেটে বুকে কুকুরের দাঁতের ক্ষত ছিল। জননী কত কাঁদিলেন তাহা বলিবার নয়।

কিন্তু সেই ঘটনা আমাকে ভিতরে ভিতরে এমন ভয়াবহ আত্মগ্লানিতে ভরিয়া দিল যে, সমস্ত পৃথিবীর রং রূপ গন্ধই আমার কাছে বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি ভয়ে, দুঃখে, গ্লানিতে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। কেবল পাগলের মতো মাকে বলিতে লাগিলাম, ওকে বাঁচিয়ে দাও না! কালীমন্দিরে নিয়ে চল, দাদু চরণামৃত দেবে, মন্ত্র পড়বে, ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু ভাল আর হওয়ার নয়। ধাঙর আসিয়া মৃতদেহটি কোদালে তুলিয়া কোথায় নিয়া ফেলিয়া আসিল। আর আমি সারাদিন বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া একা একাই বলিতে লাগিলাম, এখন কী হবে? এখন কী হবে? এখন কী হবে?

সেই দিন সন্ধ্যায় আমার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। ক্রমে চেতনা লুপ্ত হইল আমি ভুল বকিতে লাগিলাম।

জননী গিয়া কালীমন্দিরে হত্যা দিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। মাতামহ আমার মাথার কাছে বসিয়া রহিলেন।

জ্বর ছাড়িল, জ্ঞানও একদিন ফিরিল। কিন্তু আমার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গেল। কী বলিব, আজ এই বুড়াবয়সেও সেই হত্যাকারী নিজেকে ক্ষমা করিতে পারি নাই। আজও মাঝে মাঝে নির্নিমেষ লোচনে নিজের হাত

ইটির দিকে চাহিয়া থাকিলে অলক্ষ্যে এক শিশু বিড়ালের প্রাণান্তকর 'মিউ মিউ' ক্ষীণ আর্তনাদ শুনিতে পাই।

পঞ্চাশ হাজার টাকা কত টাকা তাহা তখনও জানি না। স্কুলে পড়িতে পড়িতে খানিকটা ধারণা হইল। দাদামহাশয় নাকি আমার জননীর বিবাহে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ত্রিশ হাজারের উপর তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ধার হিসাবে। টাকার অঙ্কটা জানিতাম। কারণ মাতুলালয়ে এই লইয়া প্রায়ই আলোচনা হইত।

একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল দাদামহাশয় মামলায় হারিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উকিল তাঁহাকে দেউলিয়া ঘোষণার পরামর্শ দিয়াছেন। নহিলে ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তি সকলই যাইবে।

বাড়িতে মড়াকান্না উঠিল।

দাদামহাশয় হাইকোর্ট হইতে রায় লইয়া কিন্তু হাসিতে হাসিতেই ফিরিলেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, তিনি প্রকাণ্ড একটি মাছ ও বড় এক হাঁড়ি রাবড়ি লইয়া আসিয়াছেন। আসিয়াই হুকুম করিলেন, আজ ভোজ খাব। ভাল করে রান্না কর।

বাড়ির লোকের সন্দেহ হইল, মামলায় হারিয়া তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

তা মাথা খারাপের লক্ষণই বটে। সেই সন্ধ্যায় তাঁহার যেন আহ্লাদের সীমা ছিল না। তিনি একে একে পুত্রদের ঘরে ঘরে গিয়া সকলের খোঁজখবর লইলেন। নাতি-নাতনীদের কোলে লইয়া আদর করিলেন। পাড়া প্রতিবেশীদের ডাকিয়া ডাকিয়া নানা কথা বলিলেন। একজন কাঠের মিস্ত্রি বড় ভাল রামপ্রসাদী গাইত। লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া অনেক গান শুনিলেন। তাঁহার সেদিনকার মুখশ্রী আমার আজও মনে পড়ে। এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ছিল তাঁহার মুখে।

রাত্রিবেলা সেদিন তিনি চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় অপরিমিত ভোজন করিলেন। তারপর বলিলেন, একটু মন্দিরে যাই।

সেই যাওয়াই যাওয়া। পরদিন সকালে মন্দিরের পাশে বেলগাছে তাঁহার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই দোদুল্যমান মৃতদেহটি আমিও গিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। দাদামহাশয় আমার অতি প্রিয়জন। বলিতে গেলে মা ছাড়া আমার এত নিকট মানুষ আর কেহ ছিল না। সেই প্রিয় মানুষটি গলায় দড়ি বাঁধিয়া বেলগাছ হইতে ঝুলিয়া আছেন—এই দৃশ্য আমার ভিতরে এক বিষম

ভাবাবেগের গণ্ডগোল বাঁধাইয়া দিল। যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা সত্য কিনা তাহাই বিশ্বাস হইতে চাহে না। তাহার উপর একজন জলজ্যান্ত মানুষ কী ভাবে গলায় দড়ি দিয়া নিরালম্ব ঝুলিয়া থাকিতে পারে? আর দাদামহাশয় আমার সহিত কথা কহিবে না? আর তাঁহার হাত ধরিয়া বেড়াইতে যাইব না? আর তাঁহার ক্ষীরের বাটিতে ভাগ বসাইব না?

আমার জীবনে মৃত্যুর সেই দ্বিতীয় পাঠ। প্রথম পাঠ বিড়াল শিশুর মৃত্যু। আমার জীবনে এই দুই ঘটনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহা অন্যে বুঝিবে না। ভিতরে ভিতরে এইসব ঘটনার যে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছিল তাহা আমাকে একপ্রকার পাগল করিয়া তুলিল। আমি ঘরে থাকিতে পারিতাম না। যখন তখন বিহ্বল হতবুদ্ধি হইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতাম। মজা নদীর ধারে, তাঁতিপাড়ার পিছনে কাঁটাঝোপের জঙ্গলে কিংবা গ্রামান্তরের পথে বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মৃত্যু কী? জীবন কেন? জীবন-মৃত্যু কেন ঘটিবে? মানুষ মরিলে কি আর বাঁচে না? কত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নে যে মন আলোড়িত মথিত হইতে থাকিত তাহা বলিবার নয়। আমি আপনমনে বিড়বিড় করিয়া বকিতাম।

সেদিন জেলেরা ডাকাতে দীঘিতে বেড়জাল ফেলিয়া মাছ চমকাইতেছিল সারা সকাল হাঁ করিয়া বসিয়া তাহাই দেখিলাম। দ্বিপ্রহরে বাড়িতে ফিরিয় দেখিলাম, বারান্দায় একটি অচেনা লোক বসিয়া আছে, তাহার পাদদেশে বসিয় আমার জননী অবিরল অশ্রুমোচন করিতেছেন এবং আমার বড় মামী লোকটিবে পাখার বাতাস করিতেছেন। অদূরে দিদিমাও উপস্থিত।

পরিচয় দিতে হইল না। অমি বুঝিলাম, এই ব্যক্তি আমার বাবা। কিন্তু কী এক দুর্মর লজ্জা ও শিহরিত আনন্দে আমি সেই ছুটিয়া গিয়া ঘরে লুকাইলাম, শত ডাকাডাকিতেও আর বাহির হইলাম না।

পিতৃদেবের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, থাক, থাক, ওকে ডেকো না। লজ্জ পাচ্ছে। লজ্জা ভাঙলে ঠিক আসবে।

পিতা কেমন লোক তাহা জানি না। রাগী না শান্ত প্রকৃতির? কৃপণ ন উদার? স্নেহশীল না কঠোর? মনে মনে এই লইয়া কিছু আন্দোলন ছিল। কিন্তু পিতা যে আসিয়াছেন, পিতা যে আমাদের বিস্মৃত হন নাই, তিনি যে অন্য দার পরিগ্রহ করেন নাই, এই সংবাদই তখনকার মতো যথেষ্ট।

দাদামহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াই পিতৃদেব আসিয়াছিলেন। অবিবেচক নির্বোধ বা অভিমানী মানুষ তিনি ছিলেন না। বাস্তববুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতেন বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এখন গোঁ ধরিয়া থাকিলে স্ত্রী-পুত্রের বিপদ ঘটিবে। তাঁহার আত্মমর্যাদা প্রবল ছিল, কিন্তু অভিমান ছিল না। তাই মাতামহের

ত্যুর পর শ্বশুরালয়ে আসিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই।

পিতার কথা বলিতে গেলে আমার লেখনী উদ্দাম হইয়া উঠিবে। কথা আর রাইতে চাহিবে না। এই একটি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায়, নতায় আজও আমার হৃদয় নত হইয়া আছে। অথচ পিতার সঙ্গ কতটুকুই বা াইতাম। এখনকার দিনের মতো তখন পিতাপুত্রের সম্পর্ক ইয়ারবন্ধুর পর্যায়ে র্যবসিত হয় নাই। সর্বদা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখিতে হইত। তদুপরি াটের ব্যবসা লইয়া তিনি উদয়াস্ত ব্যস্ত, বৎসরের চারি পাঁচ মাসই তিনি ানান্তরে অবস্থান করিতেন।

কলিকাতায় কাশীপুরে একটি গলির মধ্যে দোতলার একটি কুঠুরীতে পিতা ামাদের আনিয়া তুলিলেন। ঘরে আসবাব বা তৈজসপত্রের নিতান্তই প্রতুলতা। তবু সেই গৃহ আমার ও জননীর নিরানন্দ জীবনে স্বর্গসুখ রচনা রিল। এতদিনে যেন মা স্বীয় মর্যাদা পাইলেন, আমিও পাইলাম মস্ত খুঁটির জার। মাত্র একজন মানুষের অভাবে আমাদের পায়ের নিচে মাটি ছিল না।

মানুষ ক্রমে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হইতেছে। ইহা খুবই ভাল লক্ষণ। একজন াত্র মানুষের উপর নির্ভর করিয়া অন্য পাঁচটা মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ষম বিপদ। যুগধর্ম এই প্রথাকে বিসর্জন দিতে চাহিতেছে। ভবিষ্যৎকালে য়তো আর পিতামাতারও প্রয়োজন হইবে না, শিশু রাষ্ট্রের দায়িত্বেই বড় হইতে ারিবে। এখনকার কালে উৎপীড়িতা স্ত্রীরা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। বিষ্যতে হয়তো তাহারও প্রয়োজন হইবে না। বিবাহবিধি বহির্ভূত সহবাস ক্রমে মে বেশ প্রসারলাভ করিতেছে।

বাজে কথায় কাজ কী ? আসল কথাটা এই, আমার জননী নিতান্ত অসহায়া মণী। পরনির্ভরশীল হইয়া থাকা ছাড়া তাঁহার অন্য গতি ছিল না। ফলে পিতা বং পতি এই দুই পুরুষকে অবলম্বন করিয়াই বল্লরীর মতো প্রাণধারণ করিতে ইয়াছে। ইহা আমার শিশু হৃদয়েও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পতিগৃহে াসিয়া তিনি যে মুক্তির আনন্দে উদ্ভাসিতা হইয়াছিলেন তাহাও যে অন্যপ্রকার রাধীনতাই, এই বোধ তাঁহার ছিল না।

কথাটা বলিলাম এই কারণে যে, আমার পিতাও এইভাবেই আমার জননীকে পদেশ দিতেন। স্ত্রীকে লবণের পুঁটুলি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে বা গৃহসেবিকা সাবে ব্যবহার করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল। তদুপরি তাঁহাকে প্রায়ই বাহিরে াকিতে হইত বলিয়া কলিকাতায় তাঁহার ব্যবসাপত্র দেখাশুনা বা আদায় উসুল রিবার মতো বিশ্বাসভাজন লোক ছিল না। কর্মচারীরা প্রায়ই চুরি করিত, সাবের গোলমাল করিত। সুতরাং আমার জননীকে সেই দায়িত্ব কিছুটা লইতে

তিনি প্ররোচিত করেন।

পিতাকে এইভাবে কতক চিনিলাম। এক অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সংস্কারমুক্ত কাজের মানুষ। যতই চিনিলাম ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। আমার সেই শিশুবয়সে মাতামহের গভীর প্রভাব কাটাইয়া নতুন এক ব্যক্তিত্ব শিকড় গাড়িয়া বসিতেছিল।

আমার সমস্ত মনপ্রাণ উৎকর্ণ থাকিত বাবার পদশব্দের প্রতি। তাঁহার গায়ের সুঘ্রাণ, তাঁহার মিষ্ট হাসিটি, তাঁহার প্রশ্রয়প্রদাতা কণ্ঠস্বরটি, সর্বকার্যে তাঁহার প্ররোচনা ও প্রেরণা প্রদানের অভ্যাসটি আজিও আমাকে তাঁহার প্রতি সম্মোহিত রাখিয়াছে। আজকাল পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রের চোখে জল আসিতে চাহে না, মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া একটা শোকের ভাব ফুটাইয়া রাখে মাত্র। হয়তো অন্তরে কিছুটা শোক বোধও করে, তবে তাহা তেমন তীক্ষ্ণ নহে। তবে তাহাদের দোষ নাই। ইহাই যুগের ধর্ম। টান ভালবাসায় আমরা যত দেউলিয়া হইয়াছি, ভাত-কাপড়েও ততটা হই নাই। তাহা ছাড়া, ইহা যুক্তিবাদেরও যুগ, হৃদয়াবেগের নহে। হৃদয়ের চর্চা ক্রমেই কমিতেছে। মস্তিষ্ক দিয়া তো শোক করা যায় না।

আবার ধান ভানিতে শিবের গীত হইতেছে। বুড়া বয়সের ইহাই দোষ; কেবলই কথার জালে জড়াইয়া পড়িতে হয়। যাহা হউক, পিতার কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু সে কথা শুরু করিলে সহজে শেষ হইবে না। সংক্ষেপে দু একটা দৃষ্টান্ত দিই, যাহা হইতে তাঁহার চরিত্র বুঝা যাইবে। তিনি প্রত্যহই কিছু না কিছু দান করিতেন। কিন্তু লোকে যেভাবে দুটা একটা পয়সা ভিক্ষুককে দিয়ে আপদবিদায় করে তাঁহার দান সেরূপ ছিল না। অর্থী প্রার্থী আসিলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া ঘরে বসাইতেন। মিষ্ট কথা বলিতেন, সাহস, সান্ত্বনা ও ভরসা দিতেন। প্রেরণা দিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে কর্মে নিরত করিবার চেষ্টা করিতেন। তারপর যথাসাধ্য যত্ন সহকারে দীনভাবে নিরহঙ্কারতার সহিত দান করিতেন। তাঁহার দান সিদ্ধ হইত। পরিগ্রহীতাদের মুখে আমি উজ্জ্বলতা দেখিতে পাইতাম।

পিতার আর একটি গুণ ছিল। তিনি দাসত্ব পছন্দ কবিতেন না। স্বনির্ভরতাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। সেই আমলে চাকরি সুলভও ছিল না। ইংরাজ রাজত্বে বেকার অপোগণ্ডের সংখ্যা দেশে অনেক বেশী ছিল। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্তদের পরিবারে। পরিবারের একজন রোজগেরে হইয়া উঠিলে আর পাঁচজন তাহার উপর আসিয়া হামলাইয়া পড়িত। আমার পিতা এই মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং তিনি স্বাধীন ব্যবসাতে নামিয়াছিলেন। তবে কিনা আমার পিতা এও বিলক্ষণ জানিতেন যে, ব্রাহ্মণ সন্তানের ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করা

ুচিত। যজন-যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, দান-প্রতিগ্রহ এই-ই তাহার বৃত্তি। ন্তু যুগধর্ম ভিন্ন খাতে প্রবহমান। অস্তিত্বের সংকট তো তুচ্ছ নহে।

পিতা অনেকগুলি ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে পাটের ব্যবসাই ান। তখন কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গার দুই ধারে চটকলগুলির এরকম বস্থা হয় নাই। রমরম করিয়া চলিত। বাহিরেও চালান হইত। পিতা প্রথম বিঙ্গে গিয়া পাট কিনিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া আসিতেন। তারপর ক্রয় করিতেন। তখন তাঁহার সহিত আমিও কয়েকবার পূর্ববঙ্গে গিয়াছি। দীর্ঘ নপথে পাটের নৌকায় বসিয়া গ্রামগঞ্জ, দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, উদার উদাত্ত কৃতি আমার চোখে যে মায়াঞ্জন পরাইয়াছিল তাহা আজও দুটি চক্ষুর দৃষ্টিকে চ্ছন্ন বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তেমন সুসময় জীবনে কমই আসিয়াছে। াকার ছৈ-এর মধ্যে পিতার উষ্ণ বক্ষ ঘেঁষিযা ঘুমাইয়া পড়িতাম। ঢেউয়ের োলাচল আমার ক্ষুদ্র নশ্বর শরীরটাকে যেন এক অনন্তের কোলে লইয়া যাইত।

বুড়া বয়সে সেই স্বপ্নবৎ বাল্য-কৈশোরের চিত্রগুলি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ঠ। কিন্তু রূঢ় বর্তমান আসিয়া সেই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া ফেলে।

রূঢ় বাস্তবের কথা পরে বলিব। আগে সেই অমৃতময় কৈশোরকালের কথা র একটু বলিয়া লই; কাশীপুরের গলিতে আমাদের সেই এক কোঠার সংকীর্ণ বাজ্যে আমরা তিনটি মানুষ যখন স্নেহে ভালবাসায় প্রেমে ভক্তিতে একাকার যা গেলাম তখন ঐহিক দুঃখ দারিদ্র্য আমাদের স্পর্শ করিত না। আগেই লয়াছি পিতা আমাদের লবণের পুঁটুলি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে চাহেন নাই। তাকে সংসারের কাজের ফাঁকে হিসাবরক্ষক হইতে হইত। পিতার ুপস্থিতিতে তিনি ঘোমটা দিয়া পাটের গুদামে গিয়া মাল কেনাবেচারও ারকি করিতেন। আর আমিও নানাভাবে আমার পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে তার নানা কাজে লাগিয়া গেলাম। তখনই পিতার কাছে ব্যবসায়ের পঞ্চনীতি ক্ষা করি। কখনও দুইরকম দরে মাল বেচিবে না। কথা দিয়া কদাচ কথার লাপ করিবে না। লাভের চেয়ে সেবাই হইবে ব্যবসায়ের লক্ষ্য। কখনো থা ক্ষতি স্বীকার করিতে যাইবে না, কাহাকেও ঠকাইবে না, নিজেও ঠকিবে ।

পিতা আমাকে প্রায়ই বলিতেন, ব্যবসা জিনিসটা বংশগত। বংশপরম্পরায় রা ব্যবসায়ী তাদের একটা সহজ বোধ ও কুশলতা জন্মায়। আমার তা নেই। ন্তু বাঙালীর হাল দেখে বুকের জোর নিয়ে নেমে পড়েছি। আমি জানি বৃত্তিতে হ্মণ হওয়ায় এই বৈশ্যবৃত্তি আমার পোষাবে না। কিন্তু কিছু একটা তো করা

চাই। আমার পরে তোমাকেই এ ব্যবসা দেখতে হবে। এখন থেকেই তৈ
হও।

আশ্চর্যের কথা, এতদিন পিতাব ব্যবসা টিমটিম করিয়া চলিতেছিল। আম
তাঁহার সহকারী হওযাব পব অনতিবিলম্বেই তাঁহাব ব্যবসা ফাঁপিয়া ফুলি
উঠিতে লাগিল। কয়েক বছবের মধ্যেই পিতার নিজস্ব বৃহৎ গুদামঘব এবং গা
হইল। তিনি একটি চটকলের অংশীদাবীও ক্রয কবিলেন। পিতার কর্মচারী
আমাদের আত্মীযবৎ ছিলেন। কাহাকেও কাকা, কাহাকেও মামা, কাহাকেও দা
বলিযা ডাকিতাম। নিতান্ত অধস্তন কর্মচারীটিকেও শ্রদ্ধা কবিতে পিতা আমা
শিখাইযাছিলেন।

একটি ব্যবসায়িক পবিমণ্ডলেই বড় হইতেছিলাম বটে, কিন্তু পরিমণ্ডলটি
ব্যবসাযিকই বা বলি কী করিয়া? অর্থোপার্জন একটা অছিলা বটে, কিন্তু পিতা কি
কেবলই অর্থ উপার্জন কবিতেন? আমার তো মনে হয় অর্থ অপেক্ষা তাঁহা
অনেক বেশী মনোযোগ ছিল মানুষ অর্জন করিবার প্রতি। মানুষকে অর্জ
করিতে পারিলে, মানুষ যদি তোমার আপনার হইল, তাহা হইলে গোটা দুনিয়া
তোমাব হস্তামলকবৎ। আর তোমাব ভাবনা নাই। পিতা যত না অর্থ উপার্জ
করিলেন তাহার অধিক উপার্জন করিলেন মানুষ। যত্র যাইতাম তত্রই দেখিতা
পিতাকে যাহারা চিনে তাহারা গভীরভাবে তাঁহাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তাঁহা
উপদেশ লয়। চরিত্রবান পিতার সন্তান হওয়া পরম ভাগ্যের লক্ষণ। সেই দি
দিয়া আমি ভাগ্যবান। "আমার পিতা ধনী" ইহা বলিবার মধ্যে যত গৌরব তাহা
কোটিগুণ অধিক গৌরব "আমার পিতা সৎ ও চরিত্রবান" এই কথা বলিতে
পারাটা।

এই পিতাকে ঘিরিয়াই আমার শৈশব আবর্তিত হইযাছে।

মনে হয়, আজ বোধহয় সেইসব পিতার দিন শেষ' হইয়াছে। এই বহির্মু
উদ্দাম গতিসম্পন্ন জগতে পিতা একজন ব্যক্তিমাত্র, জন্মদাতা, লালন-পালন ক
এবং জোগানদার। তাহার অধিক কিছু নহে। যখন নিজে পিতা হইলাম তখন
এই সত্য বুঝিতে পারিলাম।

আমার একবিংশ বৎসর বয়সে পিতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। ঘটনাটি
আকস্মিক আখ্যা দেওয়ার কারণ, তখন পিতার বয়স বেশী হয় নাই। কিন্তু মৃ
তো বয়স বাছিয়া যথাসময়ে আসে না। পিতৃদেব সংযত জীবন যাপন করিতে
বটে, কিন্তু নিজের শরীরের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। অনিয়ম, অতিরি
পরিশ্রম, পুষ্টিকর আহার গ্রহণে অনাগ্রহ তো ছিলই, তাহার উপর ছিল রো
গোপন ও উপেক্ষা করিবার অভ্যাস। পঞ্চাশ পুরিবার আগেই একদিন অকস্মা

পেটে যন্ত্রণার কথা বলিতে বলিতে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। পেপটিক পারফোরেশনের নাম আজকাল জানি। তখন জানিতাম না। চিকিৎসকেরাও সময়মতো রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পিতৃদেব আমাদের একপ্রকার অকূলে ভাসাইয়া অনন্তে পাড়ি জমাইলেন। আমার জীবনে যে কী বিপুল শূন্যতা নামিয়া আসিল তাহা বলিবার নয়। সেই শূন্যতা আজও আমার বুকের একটা অংশ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে।

জিমি প্যাটেলের আবির্ভাব

জিমি প্যাটেলকে যদি অদূর ভবিষ্যতে দূরদর্শনে ইংরিজি সংবাদ পড়তে দেখা যায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। যদি দেব আনন্দের আগামী ছবিতে নায়ক বা উপনায়কের ভূমিকায় জিমি প্যাটেল দেখা দেয় তাহলে সেটাও হবে না বিস্ময়কর। বলতে কি, যে কোনও টি ভি সিরিয়ালে হঠাৎ তার উদয় হতে পারে। বিমল থেকে শুরু করে দেঁজ মেডিক্যাল পর্যন্ত যে কোনও বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপনে তার ধারাল মুখ ও সুন্দর শরীর ব্যবহৃত হলে কিছুই বেমানান হবে না। বলতে কি, জিমির জন্য একরকম অবারিতই রয়েছে এই রূপালি জগতের দরজা।

জিমি নাতিদীর্ঘ। ঠিক পাঁচ ফুট সোয়া দশ ইঞ্চি তার উচ্চতা। বয়স তেইশ বছর প্লাস। তার মাথায় নিগ্রোদের মতো কোঁকড়ানো ঘেঁষ চুল। সে মোটামুটি ফর্সা, মুখখানা অভিব্যক্তিময়, সামান্য কামার্ত ভাবাপন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সদাপ্রসন্ন ও তৃপ্ত। তা বলে সে যখন রেগে যায় বা ঘৃণা প্রকাশ করে তখন মুখে প্রসন্নতা বা তৃপ্তি বিরাজ করে না মোটেই। তবে সাধারণভাবে সে তৃপ্ত ও প্রসন্ন। যেন এই মানবজন্ম তার বেশ ভালই কাটছে।

জিমি পাঁচ রকম ভাষা জানে। গুজরাটি, মারাঠী, হিন্দি, ইংরিজি এবং বাংলা। চারটিই তার মাতৃভাষার মতো। বোম্বাই, দিল্লি ও কলকাতা এই তিনটে জায়গায় পর্যায়ক্রমে তার জন্ম, বাড়বৃদ্ধি, সাফল্য।

সে স্কুল ও কলেজে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছে। সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল তার ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসে। বিশেষ করে টেবিল টেনিসে। সে একজন চতুর দাবা খেলোয়াড়ও বটে। সে গল্‌ফ্ এবং বাগবিও জানে। যাকে বলা যায় সব কাজের কাজী।

স্কুল-কলেজে সে সবচেয়ে বেশি করেছে ডিবেটিং এবং থিয়েটার। বিশেষ

করে ডিবেটিং। সে আধুনিক চিত্রকলা, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মার্গ সংগীত, পপ গান সবকিছুরই খবব রাখে। তার গলায় সুন্দর শোনায় পাশ্চাত্য বা হিন্দি গানের টুকবো-টাকবা, যখন সে প্রস্তুতিবিহীন হঠাৎ গেয়ে ওঠে সময়ে অসময়ে।

জিমিব শবীব ছিপছিপে, টানটান, মেদবিহীন এবং জোরালো। সুতরাং আলিগড়ি পাজামা ও কুর্তা, স্যুট, প্যান্ট-হাওযাই শার্ট, টি শার্ট, ধুতি পাঞ্জাবি, স্পোর্টস জ্যাকেট বা নিছক ফতুয়াতেও তাকে বেশ মানিয়ে যায়। সে পরেও নানারকম। রংদাব, মজাদার, স্মার্ট, শ্যাবি সববকম পোশাকই সে পছন্দ করে।

জিমিব বাবার বোম্বাইতে একটা বাড়ি আছে আর পাবিবারিক একটা কাপড়ের পাইকাবি ব্যবসা। সেই ব্যবসা ভাগাভাগি হওয়ায় জিমি প্যাটেলের বাবা জলি প্যাটেল তাব অংশ বুঝে নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে ব্যবসা ফাঁদেন। পরে পূর্বাঞ্চলের বাজাব তাঁকে হাতছানি দেওয়ায় তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত ও বেকাব জিমিকে তিন বছর আগে কলকাতায পাঠিয়ে দেন। একা নয, অভিভাবক হিসেবে ছিল তাব দাদা জনি প্যাটেল। জনি একটু বখা ছেলে। টাকা ওড়াতে, মদ খেতে এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ ফুর্তি কবতে ভালবাসে। কার্যত জিমিকেই জনিব গার্জিযান করে পাঠানো হয়েছিল। তাবা কলকাতায ধর্মতলা মার্কেটে জলি প্যাটেলেব লীজ নেওয়া দোকান খোলে এবং পার্ক সার্কাসে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয। ফ্ল্যাটে দুখানা ঘর, একখানা জনিব, একখানা জিমিব। মাঝখানে একটা লিভিং কাম ডাইনিং। দুইজনেরই দুখানা বাজাজ সুপাব স্কুটাব আছে। দুজনেরই আছে দুখানা অত্যাধুনিক টু ইন ওযান, একটা স্টিবিও, একটা রঙিন টি ভি সেট, অঢেল রেকর্ড। একটা ছোট্ট মিনি ফ্রিজে থাকে জনিব মদের বোতল, ঠাণ্ডা জল, বরফ, জিমিব থাকে গ্রীষ্মকালে আম, শীতে কমলা বা মুসাম্বিব লেবু। আর থাকে দুধ, মাখন, চীজ এবং পাঁউরুটি। তাবা ফ্ল্যাটে বান্নাবান্নার ঝামেলা বাখেনি। হোটেল বেস্তবাঁয় খেযে নেয়। ঘবে শুধু ব্রেকফাস্ট।

দুজনে কেউ কাবও ঘরে ঢোকে না এবং কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করে না।

ফ্ল্যাটে ঢোকবার বা বেরোবার দুটি চাবি দুজনের কাছে থাকে। সুতরাং কেউ বাত করে ফিরলে অন্যের ঘুম ভাঙানোব দরকার পড়ে না।

তবে জিমি টের পায, জনি মাঝে মাঝে তার ঘরে মেয়েমানুষ আনে। কিন্তু তাবা খুব হৈ-চৈ করে না। যা করে ত প্রায নিঃশব্দে, ঠাণ্ডাভাবে। জিমি ওবিষয়ে নাক গলায়নি। এবং তার এই উদারতার প্রতিদানে জনিও কিছু করে। সে জিমিকে ছুটি দিযে নিজেই ব্যবসা সামলায। জিমিকে ঝক্কি পোয়াতে দেয় না। জিমির যে একটি ফিল্ম বা টি ভি ক্যারিয়ার হতে পারে সে বিষয়ে জনি সচেতন।

কলকাতায় জিমিব প্রথম বন্ধু বিজয়। এক বিকেলে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে

য় দাঁড়িয়ে ছিল। কোথায় যাবে তা ঠিক করতে পারছিল না। তার কোনো মিকা নেই। বন্ধুরা সব যে যার নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত। বিকেলটা কি ভাবে ানো যায় সে বুঝতে পারছিল না। জিমি তাকে স্কুটারে লিফট দিতে চাইল, ক ইউ আর গোয়িং এনিহোয়ার নিয়ার পার্ক সার্কাস আ'ল গিভ ইউ এ ড।"

বিজয় প্রথমটায় থতমত খেয়েছিল। স্কুটারে যে বসে আছে তার চেহারাখানা ন্তি। চোখেমুখে জীবন আর যৌবন ধকধক করছে। শতকরা একশভাগ জ্যান্ত র জাগ্রত এক যুবক। একটু দোনোমোনো করল সে। জীবনে বিজয় কখনো রে চড়েনি। তারপর নিরানন্দ বিকেলটার কথা ভেবে সে উঠেও পড়ল রে। ভাগ্যক্রমে সে থাকে বেকবাগানে। জিমি খুশি হয়েই তাকে বাড়ি অবধি ছে দিল এবং একটু বসলও তাদের ঘরে।

বাঙালীরা যে বেশ অমায়িক এবং বন্ধুবৎসল এটা প্রথম দিনই বুঝে গেল মি। এরা একটু বেশী কথা বলে। বিশেষ করে পলিটিকস নিয়ে। কলকাতা পর্কে এরা একটু বেশী সেনসিটিভ। অফিসের পর এরা আড্ডা ছাড়া, অলস াদন ছাডা আর কিছু করতে ভালোবাসে না।

কিন্তু জিমি নিছক আড্ডার জন্য বন্ধুত্বে বিশ্বাসী নয়। আড্ডা মানেই সময়ের চয। তার বন্ধুত্বের ধারণাও অন্যরকম। বন্ধু মানেই এ হেলপিং হ্যান্ড, দে আপদে যাব কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, ক্যাবিয়ার বিল্ডিং-এ যে সাহায্য তে পারে, যার ভাল কানেকশনস আছে।

জিমির কাছে জীবনেব প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। প্রতিটি মুহূর্ত মানেই "টু ড সামথিং টু ইওরসেলফ।" সবসময়েই নিজের ভিতরে কিছু যোগ করা। ভজ্ঞতা, জ্ঞান, সুলুক সন্ধান, জরুরী তথ্য, ঠিকানা, ফোন নম্বর। এগুলো যত ানো যায় ততই একজন মানুষের জোর বাড়ে, ব্যাপ্তি বাড়ে, সাফল্য বাড়ে। মি পলিটিকস কখনো করেনি এবং ও নিয়ে কথা বলতেও ভালবাসে না। কিন্তু দেদার পলিটিক্যাল ইনফর্মেশন বাখে। কাজেই প্রথম দিনই তার জ্ঞানের ধি দেখে বিজয় সপরিবারে মুগ্ধ।

বিজয়ের বয়স জিমির কাছাকাছি। তাব পঁচিশ প্লাস। অবিবাহিত। দাদু, বাবা পিঠোপিঠি এক দিদি, এক বোন, এক ভাই নিয়ে তার পরিবার। সে একটি াপন সংস্থায় কপি লেখে। তার বাবা ব্যাঙ্কের অফিসার। দিদি সোদপুরে ং মা যোধপুর পার্কে দুটি স্কুলে মাস্টারি করে। ছোটো ভাই এবং বোন লেজে পড়ে। এই পরিবারে জিমির মতো এরকম ফুটফুটে, প্রাণচঞ্চল, বহু ান্বিত, স্মার্ট, সুপুরুষ একটি ছেলের আগমন বা আবির্ভাব খুবই অন্যরকমের

ঘটনা। বিশেষত এত গুণ সত্ত্বেও তার বিনয় এবং সহৃদয় ব্যবহার সকলে
ভিজিয়ে দেওয়ার মতো। ঘণ্টাখানেক জিমি ছিল। খই-ফোটা ইংরিজিতে কথ
দেশী ও বিদেশী গানের টুকরো শোনানো, জ্যাজ এবং পপ নিয়ে বিশেষজ্ঞে
মতো জ্ঞানদান, কলকাতার প্রতি কমপ্লিমেন্ট সবই ছিল তার মধ্যে

জিমি চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অবধি বাড়িটার ভিতরে জিমির প্রভা
ঝিমঝিম করতে থাকল।

বিজয়ের কাছে জিমির এই আবির্ভাব কাজ করল আত্ম-উন্মোচনকারী ঘটনা
মতো। রাত্রে শুয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে জিমির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখ
এবং ভাবল, ওর তুলনায় আমি কত আনস্মার্ট, আনসাকসেসফুল, অনুজ্জ্বল, ক
কম ইনফর্মড়। এইসব ছেলের জন্যই দুনিয়ার যত ভোগ্যবস্তু।

পঁচিশ বছর বয়সী বিজয় পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম এ। কলেজে থাকতে
ইউনিয়ন করত এবং এখনও তার মনোভাব একটু বাম-ঘেঁষা। সে কোনোকালে
তেমন খেলাধুলো করেনি বলে শরীর সুগঠিত নয়। ফিটনেসের অভাব আ
বেশ। শরীর নিয়ে সে মাথা ঘামায় না এবং নিজের তেমন যত্ন নেয় না

তার মনে পড়তে লাগল, জিমিকে দেখে তার বোনের চোখ কেমন ঝলম
করছিল, কেমন মুগ্ধতা দেখা দিয়েছিল তার দিদির চোখে, কেমন মায়াময় হ
গিয়েছিল তার মা। এবং সে তার ভাই এবং বাবা— অর্থাৎ পুরুষরা কেম
ভ্যাবাচ্যাকা, অপ্রস্তুত এবং কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল ওই উজ্জ্বলতার সামনে

তার বোন তিথি কি জিমির প্রেমে পড়ে গেল ? তার দিদি পূর্বা ?

বিজয়ের ভয় হতে লাগল, দিল্লি থেকে আগত এই উজ্জ্বল যুবা কলকাতা
যাবতীয় যুবতীর হৃদয় হরণ না করেই ছাড়বে না।

বিজয় হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা কাজের চেয়ে চিন্তা করতেই বে
ভালবাসে। এদের এক কথায় কী বলা যায় তা ভেবে ওঠা মুশকিল। তেম
যুৎসই প্রতিশব্দ বাংলায় আছে কি ? ভাবনকাজী শব্দটা কিছু কাছাকাছি। বিজ
চিন্তা করতে ভালবাসে বটে তবে তা গঠনমূলক চিন্তা নয়। যে চিন্তা কেবল
অলস লূতাতন্তুজাল রচনা মাত্র। তবে অপ্রাপ্য সবকিছুকেই এই অলৌকি
ভাবনঘরে বসে সে পেয়ে যায়।

অন্যদিকে জিমি প্যাটেল ফালতু চিন্তা কখনোই করে না। তার চিন্ত
সবসময়েই কোনো না কোনো মতলব হাসিল করার বিষয়ে। চিন্তাকে কাজে
অনুবাদ করাই তার সর্বক্ষণের ধান্দা। সে জানে, দুনিয়ায় কেউ তার মুখে দুধে
বাটি এগিয়ে দিতে আসবে না। তবে দুধও আছে, বাটিও আছে, এগিয়ে দেওয়া
হাতও আছে। শুধু যোগাযোগটা ঘটিয়ে তুলতে পারলেই হল। সারাদিন ধ

ইসব যোগাযোগ বা যোগ-বিয়োগই সে করে।

সেই রাতে বাড়ি ফিরে স্কুটারটা গ্যারাজ করে শিস দিতে দিতে জিমি প্যাটেল ধীরে ধীরে দোতলায় উঠল। নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক ছাড়ার আগে সে জেকে দেয়ালের বড় আয়নায় প্রত্যক্ষ করল খুঁটিয়ে। তার মনে হল সে ওদের লই ইমপ্রেস করেছে। অবশ্য মধ্যবিত্তদের ইমপ্রেস করা সোজা। মুশকিল হল য়ার সার্কেলে। সেখানে তার মতো ব্রাইট ছোকরার সংখ্যা অগুন্তি। কিন্তু এই বারটাও তার কাজে লাগবে। বিজয়ের বাবা মিস্টার চ্যাটার্জি কথায় কথায় ঙ্কের ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দহরম মহরমের কথা বলছিলেন। ডিরেক্টরের নাম গুলী। নামটা জিমি ডায়েরিতে টুকে রাখল। কে একজন গায়িকা আছে, তকী ঘোষ। পূর্বা তার কাছে গান শিখত, বলছিল। নামটা টুকে রাখল মি। বাংলা ভাষাটা শক্ত বলে তার মনে হচ্ছে না। ভাষার একটা প্রখর তি আছে জিমির। সে সহজেই অন্যের ভাষা শিখে নিতে পারে। বাংলা চ্ছে লোকাল ল্যাংগুয়েজ। কলকাতায় বাজার জমাতে গেলে এ ভাষাটাও শিখে ে ভাল। পূর্বা উইল হেল্প। মহিলা অবিবাহিত, স্লাইট্‌লি এজেড, সেক্স র্ভড়, এসব মহিলারা খুব হেলপ্‌ফুল হয়। জিমি আর ভাবল না। ঠাণ্ডা দুধ য়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমোলো না বিজয়। পঁচিশ বছর জীবনের নানা ব্যর্থতার কথা ভাবতে বতে গ্লানিতে ভরে গেল সে। সত্যি কথা বলতে কি, আত্ম-উন্মোচনের খেলা শী খেলতে নেই। ওই আত্ম-উন্মোচনের ঝাঁপিটি মঝে মাঝে একটু খুলে দেখা ল। কিন্তু বেশী উন্মুক্ত করলেই ভিতর থেকে নানা বর্ণের নানা আকারের নানা যের সাপ বেরিয়ে এসে ঘর ভরে কিলবিল করতে থাকে। ডালাটা আজ বড্ড শী খুলে ফেলেছে বিজয়। সাপগুলোকে আবার ঝাঁপিতে পোরা কঠিন হবে।

সুতরাং বিজয় দোতলার বারান্দায় এসে চেয়ার পেতে বসল। কিছুই দেখার ই। সামনে রাস্তায় আলো জ্বলছে। কিছু প্রাণহীন বাড়ি। ফুটপাথে টান টান য়া কিছু মানুষ। ঠুনঠুন করে রাত্রে রিক্‌শা চলে যায়। ট্যাকসির আওয়াজ। রুমের দরজায় শব্দ। কুকুর ডাকছে। বিজয় বসে থেকে টের পেল, পাশের টের ঝম্পটিবাবুও পার্টিশানের আড়ালে তাঁদের বারান্দায় বসে আছেন। কাই স্বাভাবিক। ঝম্পটিবাবু পাগল।

ঝম্পটি জেগে আছে টের পেয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে পার্টিশানের ওপাশে উঁকি য় বিজয় বলল, ঝম্পটিবাবু, ঘুমোননি ?

কে, বিজয় ? না হে, ঘুম আসছে না। তোমাদের বাড়িতে কে এসেছিল বলো আজ ! খুব হাসি, গান, হল্লা শুনছিলাম। তোমরা তো এত হাসো না

কখনো।

ও একটা নন-বেঙ্গলী ছোকরা। দিল্লীর মাল। খুব ওপর-চালাক পালিশওলা ছেলে, তবে ভিতরে ঢু-ঢু।

যাকে তাকে হুট করে বাড়িতে এনে ফেল কেন? কিসের থেকে কী হয়ে যায় তখন হায়-হায় করতে হবে। এই আমারই অবস্থা দেখ না। চোখের সামনেই স হয়ে যাচ্ছে, কিছুই আটকাতে পারছি না।

বিজয় বিস্মিত হয়ে বলল, কী আটকাতে পারছেন না?

ঝম্পটি পট কবে পিছনের দিকে চেয়ে নিজের অন্ধকার ঘরটা দেখে নি স্টিলের ইজিচেয়ারটা রেলিং-এর একেবারে কাছে টেনে এনে চাপা স্বরে বল ছোকরা হে ছোকরা, দুনিয়াটা বদ ছোকরায় ভরে গেল। পাড়ার বক- সিনেমায়, রাস্তাঘাটে তো তারা আছেই। এমন কি খাটের তলায় ছোক আলনার পিছনে ছোকরা, বাথরুমে ছোকরা, এমন কি হুট করে যদি গিয়ে ঘ ঢুকি এখন, দেখব বিছানাতেও ছোকরা শুয়ে আছে··· হিঃ হিঃ···

বিজয় যতদূর জানে, ঝম্পটিবাবুর স্ত্রী ঠিক ওরকম নন।

বিজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় এসে শুল এবং ঘুমিয়ে পড়ার অ মুহূর্ত পর্যন্ত শুনতে পেল, তাদের বারান্দার উদ্দেশ্যে ঝম্পটিবাবু নাগাড়ে ফি ফিস করে নিজের জীবনকাহিনী বলে যাচ্ছেন। অন্তত ঝম্পটিবাবুর চেয়ে অনেক উন্নততর অবস্থায় আছে একথা ভেবে অবশেষে তার ঘুম এসে গেল

পরদিন সকালে উঠে বিজয় ভাবল, জীবটাকে একটু অন্য খাতে বওয়া পক্ষে কি খুব দেরী হয়ে গেছে? পঁচিশ প্লাস কি খুব বেশী বয়স? কলকা শহরে তো স্কোপের অভাব নেই। ইচ্ছে করলেই সে ব্যায়াম করতে পারে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে পারে। গানের স্কুলে ভর্তি হতে পারে।

তার অফিসটা খুবই ছোটো, বিজ্ঞাপনের বাজার চড়া হলেও তার এই বাঙা কোম্পানির টিকে থাকতে নাভিশ্বাস উঠছে। বিজয়ের আর কোথাও যাওয় নেই বলে এখানেই পড়ে আছে। মাইনে যা পায় তা কহতব্য নয় এবং তারিখে তো নয়ই, প্রতি মাসেও তা পাওয়া যায় না। তবে অফিসে কাজ ক আড্ডাই বেশি। এই অফিসে থাকলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

জিমির আবির্ভাবের পর সাতদিন তিথি একটা ঘোরের মধ্যে রইল। বন্ধুদে কাছে সে এই আবির্ভাবের গল্প এমনভাবেই করেছিল যে বন্ধুরা অবশেষে ঠা করতে শুরু করল।

তুই একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিস রে তিথি।

ভিজে যাচ্ছিস রে।

ভাই তিথি প্যাটেল, তুই যে সত্যিই পটল তুললি।

এসব রোমাঞ্চকর ঠাট্টা বস্তুত কণ্টকিত আর শিহরিতই করেছে তাকে। দুদিন সে জিমি প্যাটেলকে স্বপ্ন দেখল। এক পাহাড়চূড়ায় হাওয়াইয়ান গীটার হাতে কোমর দুলিয়ে পপ গান গাইছে জিমি প্যাটেল। নিচে উপত্যকায় লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মধ্যে রেগন, রাজীব, অমিতাভ বচ্চন। আর, দ্বিতীয়টা একটি আলো-জ্বলা এবং একটি অন্ধকার ঘরের মাঝখানের দরজাটিতে দাঁড়িয়ে জিমি যেন কার সঙ্গে ফিসফিস করে ফষ্টিনষ্টি করছে। কে মেয়েটা ? দিদি ? মা ? অন্য কেউ ? যদিও স্বপ্ন, তবু হিংসেয় জ্বলে গেল তিথি।

কিন্তু দিন সাতেক বাদে এক সাপ্তাহিক দিনে অফ পিরিয়ডে ফুচকা আলুকাবলি জাতীয় কুখাদ্যের খোঁজে সবান্ধবী কলেজ থেকে বেরিয়ে তিথি ইলেকট্রিক শক খেয়ে গেল। একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। দরজায় জিমি প্যাটেল।

তিথি সপ্রতিভতা খুঁজে পাওয়ার আগেই জিমি তার গম্ভীর গলায় ডাক দিল, হাই তিথি!

তিথি স্ট্যাচু। বন্ধুরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

জিমি প্যাটেলই লজ্জা থেকে বাঁচাল তাদের, ইফ ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু জাস্ট নাউ, আই'ল বি গ্ল্যাড টু টেক অল অফ ইউ টু এ হাই টি।

তিথি সিদ্ধান্ত নিতে না নিতেই বন্ধুরা ঝপাঝপ উঠে পড়ল ট্যাকসিতে। অগত্যা তিথিও। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে বসে গেল পিছনের সিটে পাঁচজন। সামনে জিমি আর ড্রাইভারের মধ্যবর্তী হয়ে আরও দুজন। হা হা হি হি হু হু। বাক্যহীন হাসির হর্‌রায় মুহুর্মুহু ভরে যেতে লাগল ট্যাক্সির অভ্যন্তর। একটু গোমড়ামুখে পিছনের সীটে জানালার ধারে বসে তিথি টের পাচ্ছিল, জিমি তার একান্ত নিজস্ব ছিল, কেমন করে যেন এক লহমায় অনেকের হয়ে গেল।

রেস্টুরেন্ট-ফেস্টুরেন্ট নয়, জিমি তাদের সোজা নিয়ে গেল ভিকটোরিয়ার সামনে। খুব বেশি পয়সা খরচ করল না, কিন্তু খাওয়াল ভারী মুখরোচক খাবার। পাউভাজি, বটাটা পুরী, দহিটিকিয়া। ঝাল নোনতা টক খেতে খেতে উদোম মাঠের পটভূমিতে অতগুলো কিশোরী প্রজাপতির মতো পাখা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উড়তে লাগল একটি ফুলের পরাগকোষকে লক্ষ্য করে।

জ্বলতে জ্বলতে তিথি দেখল। সে জানত সে তেমন সুন্দরী নয়। কয়েকটা দিন সে কথা মনে ছিল না। আজ ভাবল, যদি আমি আর একটু সুন্দরী হতুম! আরও কিছুটা ফর্সা হত রং! যদি ইংরিজি বলতে পারতুম অবিরল!

কিন্তু সুন্দরী, গৌরী, ইংরিজিনবিশ হয়েও তেমন লাভ ছিল না। জিমির তো পক্ষপাত নেই। ওই যে মোটা পাশবালিশের মতো চেহারার নিনা—হোক না

ওর দাদু হাইকোর্টের জজ—ওকেও তেল দিচ্ছে জিমি। কাঞ্চনের বাবা ফিল্ম প্রডিউসার হলে কী হয়, কোনও ফিলমে ঝি-এর পার্টও পাবে ও ? ওই চেহারার কাঞ্চনকেও তো কম খাতির দেখাচ্ছে না জিমি ! মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে পকেট থেকে নোটবই বের করে কী যেন টুকে নিচ্ছে জিমি। ঠিকানা কি ? ফোন নম্বরও ? তিথি ঠোঁট কামড়াল। তবে জিমি তিথিকেও উপেক্ষা করল না মোটেই। পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেল ফুচকাওলার কাছে।

হোঁচট-খাওয়া ইংরিজিতে তিথি জিজ্ঞেস করল, হোয়াট আর ইউ রাইটিং ইন ইওর নোটবুক ?

অল দি অ্যাড্রেসস, ফোন নাম্বারস্। এভরিথিং কাউন্টস্ ইউ নো।

তিথি কী বলবে ? এটা সে জেনেই গেছে যে, জিমি ওইসব ঠিকানায় হানা দেবে। ফোন করবে। আর কী করবে কে জানে ! ফুচকা যে খেতে এত খারাপ হয় তা কখনো টের পায়নি তিথি।

তিথি বুঝতে পারল এই জঙ্গলের জিমিকে তার চাই না। সে হঠাৎ ঘোষণা করল, লাস্ট পিরিয়ডে পি বি-র জিওগ্রাফি ক্লাসটা আমাকে করতেই হবে।

ঝরা আর সোমারও জিওগ্রাফি কম্বিনেশন আছে। কিন্তু তারা নড়ল না। জিমি অসহায়ভাবে তার দিকে চেয়ে বলল, আই মে টেক ইউ টু দি কলেজ। বাট...

সকলে কলস্বরে বলে উঠল, না না, জিওগ্রাফি ক্লাস করবে তো একা যাক না। বাস মিনিবাস কত চলছে।

অগত্যা তিথি একাই কলেজে ফিরল। তিথি জিওগ্রাফি ক্লাসে বসে সারাক্ষণ একটা দৃশ্য মনশ্চক্ষে দেখতে পেল। সবুজ মাঠের মাঝখানে জিমিকে ঘিরে তার নির্লজ্জ বান্ধবীরা। জিমি তাদের শোনাচ্ছে তার পুরুষোচিত গলায় হিন্দি হিট গান, পপ সং, মজার গল্প মিমিক্রি। ভূগোল তার কানে ঢুকলই না।

কালীকিংকর, গোপু ও ফড়িং

বেঞ্চটায় আজও কে যেন ইঁটের গুঁড়ো ছড়িয়ে রেখে গেছে। কাল ছিল গঁদের আঠা। ঘুড়ি ওড়ানোর মরশুম আসছে। ঘুড়িবাজ ছেলেপুলেগুলোই হবে। কালীকিংকর এসবের জন্য প্রস্তুত হয়েই আসেন আজকাল। পাঞ্জাবির পকেটে পুরোনো ন্যাকড়া থাকে। তাই দিয়ে জায়গাটা ঝেড়ে নিয়ে বসলেন। বোগাভোগা নাতিটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, যা খেলগে যা।

খেলগে যা বললেই যে নাতি গিয়ে খেলতে নেমে পড়ে, এমন নয়। ছিঁচকাঁদুনে কুনো দুর্বল ছেলেটা শুধু দুচার পা দূরে গিয়ে মাটি থেকে হাবিজাবি কুড়োয়, আপনমনে বকবক করে আর মাঝেমধ্যেই এসে চিন্তারত দাদুর হাঁটু ধরে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শরীরের এমন গৎ নেই যে দুপাক ছুটে আসবে গিয়ে। কালীকিংকর পাঞ্জাবির পকেট থেকে লাল একটা বল বের করে নাতির হাতে দিয়ে বলেন, দেখো, নোংরায় ফেলো না।

নাতি বলটা নেয় এবং আবার কয়েক পা দূরে গিয়ে বলটা বুকে নিয়ে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না। স্ট্যামিনা নেই, ক্ষমতা নেই, হাঁটুর জোর নেই, শুধু বেঁচে আছে ছেলেটা। আর ওসব থাকবেই বা কি করে। ওর দজ্জাল মা সকাল থেকে শুরু করে রাত অবধি কেবল কোঁত কোঁত করে গেলাচ্ছে। ডিম, কলা, রুটি, গুচ্ছের ভাত, মাখন, মাছ, টেংরির জুস, ফলের রস। ছেলেটা খেতে চাইত না। পারে নাকি অত খেতে? তো দজ্জাল মা তা না খেলে দমাদ্দম পেটাত। সেই পিটুনি খেয়ে খেয়ে নির্জীবমতো হয়ে গিলতে শুরু করল। হড়াক হড়াক বমি করে ফেলত। তারপর আবার খাওয়া। এই করে করে ছেলেটা এখন খায়। কোনো স্বাদ পায় না, আনন্দ পায় না, খেতে হয় বলে খায়। আর সেই বিপুল খাবার হজম করতে গিয়ে গোটা শরীরের সব রসকষ, ক্ষমতা, স্ট্যামিনা পেটে গিয়ে পোঁটলা পাকিয়ে আছে। লিভারের বারোটা বেজেছে। রোগ ঠেকানোর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই বলে বারো মাস পেট খারাপ, জ্বর, সর্দিকাশি। বারোমাস ওষুধ আর টনিক চলছে। শুধু মাত্র ওই বিপুল, অন্যায়, অনায্য খাওয়ার হাত থেকে যদি কালীকিংকর নাতিটাকে বাঁচাতে পারতেন তবে হয়তো ওর প্রাণশক্তি এত তলানিতে ঠেকত না।

কিন্তু ঠেকাবেন কী করে? ওই বজ্জাত মেয়েছেলেটাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া মানেই তো ঘরের মধ্যে কালবোশেখী ডেকে আনা। ওই বউয়ের জন্য নাতিটা ভুগছে, ছেলেটা কেমন ভ্যাবলা ব্যক্তিত্বহীন মেরে যাচ্ছে দিনকে দিন। বাড়ির আবহাওয়াই কেমন দূষিত, থমথমে, ভারাক্রান্ত।

সত্য বটে কালীকিংকরের নিজের বউ কিন্তু অন্যরকম নয়। একটা জীবন বউ নিয়ে কালীকিংকরের মা ভাজা ভাজা হয়েছেন। কালীকিংকর নিজেই হারিয়ে ফেলেছিলেন জীবনধারণের অর্থ। তবু কালীকিংকর একেবারে আত্মসমর্পণ করে দেননি। প্রতিবাদযোগ্য কথার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছেন। ঝগড়া হাতাহাতি তুঙ্গে উঠেছে। তবু শেষ অবধি তিনি স্ত্রৈণত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর বড় ছেলে বিমলকে তা করতে হয়েছে।

নাতিটার দিকে আনমনে চেয়ে এইসব মনে পড়ল কালীকিংকরের। রোজই

পড়ে। সংসার হচ্ছে এক বহুবার পড়া বই। রোজ তারই এক একটি পড়া পৃষ্ঠা খুলে আর একবার পড়া। তবে একটা ব্যাপার কালীকিংকর আজকাল উপভোগ করেন। যখন তাঁর বউয়ের সঙ্গে বিমলের বউয়ের লাগে। সে এক ধুন্ধুমার। দূষিত পয়ঃপ্রণালীর মুখ খুলে যাওয়ার মতো ঘটনা। পৃথিবীর এমন কোনও অশ্লীল শব্দ নেই যা সেই ঝগড়ায় ব্যবহৃত হয় না। কালীকিংকর একরকম খুশিই হন। একটা দজ্জাল মেয়েছেলে আর এক দজ্জালের কাছে নাকাল তো হচ্ছে। শেষ অবধি একসময়ে কালীকিংকরের বউ সুরভিকেই রণে ভঙ্গ দিয়ে কাঁদতে বসতে হয়। কারণ সংসারের সিংহভাগ খরচের যোগানদার ওই বিমল আর তার বউ অন্বেষা ওরফে অনু। কালীকিংকরের যা আছে তা ছোটো মেয়ে কেয়ার বিয়ের জন্য রাখা। ছোটো ছেলে অমল এখনো একরকম বেকার। কিছু একটা করে, কিন্তু সংসারে দেওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছোয়নি।

বিকেলের দিকে পার্কের বেঞ্চ খালি পাওয়া প্রায় লটারি পাওয়ার সামিল। কিন্তু কালীকিংকর এই বেঞ্চখানা রোজই পেয়ে যান। উত্তরের দিকটায় একটা পুরোনো পেচ্ছাপখানা ছিল। এখন এত নোংরা যে, তার ত্রিসীমানায় যাওয়া যায় না। লোকে তাই ওই পেচ্ছাপখানার আশেপাশেই মূত্র এবং মলও ত্যাগ করে যায়। যেতে যেতে অনেকটা জায়গা জুড়েই নারকীয় কাণ্ডটি ব্যাপ্ত হয়েছে। তীব্র গন্ধে পার্কের এই দিকটাতে লোকই আসে না। তার ওপর কালীকিংকরের বেঞ্চখানাও বেশ নড়বড়ে। বিপজ্জনক। সিমেন্টের বেদীতে বল্টু ঢিলে হয়ে বেঞ্চ এখন ঢকাঢক নড়ে। এই বেঞ্চে বসতে হলে নাক কান চোখ এবং রুচি এসবের বালাই থাকলে চলে না। কালীকিংকরের ওসব বালাই ঘুচে গেছে। তাই বসতে পারেন। তার নাতি প্রথম প্রথম আপত্তি করত, এখন তারও সয়ে গেছে। মানুষের সবই সয়, সে অভ্যাসের দাস।

কিন্তু এই বেঞ্চখানা নিয়ে ইদানীং একটু ভয় ধরেছে কালীকিংকরের। তিনি লক্ষ্য করেছেন, পার্কের দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকের অনেকটা রেলিং সম্প্রতি লোপাট হয়েছে। লোহাচোরেরা কিছুই ছাড়ছে না আজকাল। তাঁদের গলির একটা ম্যানহোলের ঢাকনা বছরখানেক যাবৎ নেই, একখানা কংক্রিটের স্ল্যাব চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাতে প্রায়ই লোকে হোঁচটও খাচ্ছে। এই বেঞ্চখানাও একদিন লোহা চোরেরা খুলে নিয়ে যাবে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। বেঞ্চের লোহার কাঠামোটা বেশ পুরোনো এবং নিরেট। বোধহয় ব্রিটিশ আমলের, যখনকার সব জিনিসই ছিল হাই কোয়ালিটি।

কালীকিংকরের বহুদিনকার ইচ্ছে এই বেঞ্চেই একদিন সকালে বা বিকেলে

কেৎরে মরে পড়ে থাকেন। সেরিব্রাল বা করোনারী বা আচমকা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক—এ সবই কালীকিংকরের পছন্দ। বেশ ঝপ করে হয়ে যায় ব্যাপারটা। বেশি দগ্ধে মারে না। সকালের দিকে হওয়াই ভাল। তখন নাতিটা সঙ্গে থাকে না। বিকেলে হলে নাতিটা কিছুক্ষণ বেওয়ারিশ থাকবে। সেটাও ভয়ের।

এসব রোজই ভাবেন। বেঞ্চে বসে লাঠিগাছা পাশে রেখে তিনি পিছনে হেলান দেন। বেঞ্চটা ঢক করে দুলে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। হয়তো বলে, এই যে, কেমন?

কালীকিংকর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে জবাব দেন, আর কেমন!

নাতিটা আজ একটা ফড়িং দেখছে। এই পার্কে গাছপালা নেই, উদ্ভিদ নেই, বনস্পতি নেই। ফড়িংটা তবে এল কোথা থেকে? তিনিও কৌতূহলী হয়ে একটু ঝুঁকে দেখলেন। ভাঙা রেলিঙের ধারে ধুলোটে একটু ঘাস আর চোঁরকাটার মুঠোভর প্রকৃতিতে একটা ফড়িং থিরথির করছে। উড়ছে বসছে, পাখা নাচাচ্ছে। অস্তিত্বের খুবই সংকট ফড়িংটার। বেশিক্ষণের আয়ু নয় ওদের এই যা রক্ষে।

নির্জীব হয়ে যাওয়ার একটা সুবিধে হয়েছে এই যে, আজকাল চোখ বুজলেই তন্দ্রা চলে আসে। বেশ গাঢ় তন্দ্রা। স্বপ্ন-টপ্নও দেখা যায় তাতে।

ও গোপু, কাছাকাছি থেকো।

গোপু নাতির ডাকনাম। ভাল নাম চন্দ্রক। ওর বাপ-মাই রেখেছে। নামটা খারাপ নয়। তবে এর মানেটা আজও কালীকিংকর জানেন না। সুরভি নাতিকে গোপাল বলে ডাকেন, সেই থেকে গোপু।

গোপু ফড়িং দেখে এসে দাদুর হাঁটু ধরে দাঁড়াল, ওটা কী?

কালীকিংকর প্রশ্নটা আশা করছিলেন। একবার প্রশ্নমালা শুরু হলে আর রেহাই নেই। চলবে তো চলবেই।

তিনি বললেন, ওটা ফড়িং। যাও খেল গে যাও। বলটা ছুঁড়ে ফড়িংটার গায়ে লাগাও দেখি কেমন পারো।

ওটা ফড়িং?

হ্যাঁ।

ফড়িং কি পাখি?

হ্যাঁ, ওরকমই। পাখা থাকলেই পাখি।

কামড়ায়?

তা কামড়াতেও পারে। দুষ্টুমি করলে কামড়ায়।

বল দিয়ে মারলে যদি কামড়ে দেয়?

তাহলে মেরো না। বড্ড ভীতু তুমি। যাও, খেলো গে যাও।

ওইটুকু ছেলেও বোঝে কার কাছে সে কখন অভিপ্রেত নয়। যেমন এখন বুঝল, দাদু তাকে চাইছে না। বলটা বুকে করে সে একটু দূরে চলে গেল। একবার পিছু ফিরে দাদুব দিকে তাকাল। মুখখানা কাঁচুমাচু। একটু কষ্ট হল কালীকিংকরের। নাতিটা যথেষ্ট আদর পায় ঠিকই, কিন্তু ওরও বোধহয় মনে শান্তি নেই। যাদের ওপর ওর টান-ভালবাসা তারা দিনরাত ঝগড়া করে। ঝগড়া শুনতে শুনতে অনেক সময়ে ক্লান্ত হয়ে রোগা ছেলেটা ঘুমিযে পড়ে যেখানে সেখানে। মুখখানায গভীব বিষাদ মাখা থাকে তখন। বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমেব মধ্যে।

গোপু বলটা মাটিতে ফেলল। রবারের বল লাফিয়ে উঠল বুকসমান, আনন্দে। গোপু হাত বাড়িয়েও ধবতে পারল না। বলটা মাটিতে পড়ে আবার লাফাল, গড়িয়ে গেল একটু। গোপু গিয়ে সন্তর্পণে সেটাকে তুলে নিয়ে বুকে ধরে থাকল। তিন বছর পার হয়ে গেছে। এখনও বলটল খেলতে পারে না একটুও! চার-চারটে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে পারেনি। পারবে কি করে। ওর ওই দুর্বল, সাদা, ক্ষয়াটে, খর্বুটে চেহারা দেখেই তো সবাই নাকচ করে দেয়। তার ওপর কথা জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে থাকে ভ্যাবলার মতো। আর এই নাতিকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য বার্থ সার্টিফিকেট আনতে করপোরেশনে গিয়ে টানা মেরে দুদিন বসে থেকে এসেছেন কালীকিংকর। আগের দিনে বয়স নিয়ে এই চুলচেরা বিচার ছিল না। আজকাল বয়স সাঙ্ঘাতিক জিনিস। নাতির বয়স একটু কমিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁব। কিন্তু হয়নি। অথচ কমিয়ে রাখতে পারলে আখেরে কাজ হত। এবছর তো অ্যাডমিশন টেস্টে পারল না, আগামী বছর একটু তৈরি হয়ে নিয়ে ফের ওই একই ক্লাসে ভর্তি হতে পারত।

দিনকাল বড্ড দ্রুততালে পাল্টে যাচ্ছে। কালীকিংকর বেশ একটু বেশী বয়সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তবু হেসেখেলে স্কুল থেকে পাশ করে বেবোতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। কিছু অসুবিধে হয়নি। তখন ভাল স্কুলেও উঁচু ক্লাসে নিত, আজকাল মাঝারি স্কুলেও নেয় না।

গোপুর এই অক্ষমতা তার মা ক্ষমা করেনি। অ্যাডমিশন টেস্টের ফল বেরোয় আর রোগা ছেলেটা দমাদ্দম মার খায়, অন্যায্য গালাগাল হজম করে।

নাতিটাকে ওর মায়ের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কথাও ভেবেছেন তিনি। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাঁর যাওয়ার জায়গা আর বিশেষ নেই! সব কপাটেই একে একে খিল পড়ে যাচ্ছে।

কালীকিংকর পিছনে হেলে বসলেন। বেঞ্চটা ঢক করে নড়ল। আজ পেচ্ছাপের গন্ধটা একটু বেশীই লাগছে নাকে। জ্বালা করছে চোখ। মানুষের

শরীব থেকে আজকাল বোধহয় অধিকতর দূষিত জিনিস বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছেই। বিষও বেশী জমছে যে। অখাদ্য, কুখাদ্য, ভেজাল, মদ।

কেৎবে বসে কালীকিংকব চোখ বুজে ফেললেন। রোজই এই সময়টায় তাঁব একটু ঘাম পায়। কেন পায কে জানে। হয়তো পেটে অম্বল জমে জমে একটা মাদক কিছুব উৎপত্তি হয শরীরে। রাম কবিরাজ বলেছিল, পেটে বেশী অম্বল জমে থাকা ভাল নয। ঘা হলে এই বুড়ো বয়সে তা আর শুকোবে না, ক্যানসারে টার্ন নেবে।

নিক। কী আব করবেন। চিকিৎসা হবে না, না হল। চিকিৎসায় তো লাভও কিছু নেই। তবে ক্যানসারেব দীর্ঘস্থায়ী কষ্ট আছে।

গোপু, বেশী দূবে যেও না। অর্ধোন্মীলিত চোখে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন।

না, গোপু বেশী দূরে যায়নি। ফড়িংটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফড়িংটা একবার উড়ছে, বসছে। ফের উডছে। আবার বসছে। গোপু হাঁ করে দেখছে।

কালীকিংকরও দেখলেন। ফডিং-টডিং আজকাল বড় চোখে পড়ে না। ছেলেবেলায় তিনি ভারী পাষণ্ড ছিলেন। ফড়িং ধবে জ্যান্ত অবস্থায় ডানা ছিঁড়ে ফেলে মজা দেখেছেন কত। শুধু কি ফড়িং ? প্রজাপতি, আরশোলা, পাখি কত কি মেরেছেন। সেইসব পাপ কি অর্শায় ?

পাপ-পুণ্যে আজকাল আর বড় বিশ্বাস নেই কালীকিংকবের। ভগবানে বিশ্বাস আছে কিনা তাও বুঝতে পারেন না। আজকাল ভগবানের কথা মনেই পড়ে না। থাকলে আছে, না থাকলে নেই। কালীকিংকরের আর কিছু যায় আসে না তাতে। কালীকিংকর আব ভয় বা ভক্তি কোনোটাই করেন না। পাপ যে অর্শায় না তা অহরহ নিজের চোখেই দেখছেন। চোর, খুনে, ঘুষখোর, ভেজালের কারবারী, মিথ্যেবাদী, ঝগড়ুটে, মারকুটেরা এই সংসারে যথেষ্ট সুখে আছে। সুতরাং ছেলেবেলায করে ফডিং মেরেছেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

তবে আজ ফড়িংটা দেখতে বেশ ভাল লাগল। এরাও আছে দুনিয়ায়। বেশ আছে।

ভাবতে ভাবতে কালীকিংকর একটু ঢুলে পড়লেন। কলকাতায় শীত আসি-আসি করছে। পূজো কেটে যাওয়ার পর এখন সকালে বিকেলে বেশ একটু হিমেল ভাব। শরীবটা বুড়ো হয়েছে বলেই ঠাণ্ডাটা চট করে টের পান। কফের ধাত আছে। তাই জামার নিচে, গেঞ্জীর ওপরে একটা ছেঁড়া পুরোনো সোয়েটার চাপিয়ে এসেছেন। তাতে একটু ঘাম হচ্ছে। রোদ পড়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে।

দাদু !

উঁ !

ঘুমোচ্ছো কেন ?

ঘুম আসছে যে ।

ফড়িংটা ধরে নিয়ে গেল ।

কে ? কে ধরে নিয়ে গেল ?

ওই যে !

কালীকিংকর তাকালেন । ফড়িংটা নেই বটে ।

কে নিয়ে গেল বলো তো !

গোপু আঙুল তুলে একটু দূরে এক দঙ্গল ছেলেকে দেখিয়ে বলল, ওই যে ।

ওরাও বাচ্চা ছেলে । ফড়িং দেখে নিতান্তই বাল্য চপলতার প্রভাবে ধরে নিয়ে গেছে । খুবই স্বাভাবিক ঘটনা । এতক্ষণে ফড়িংটার অন্ত্যেষ্টিও বোধহয় শেষ হওয়ার মুখে ।

কালীকিংকর উদাস মুখে বললেন, কী আর হবে । ধরে নিয়ে গেলে তো কিছু করার নেই ।

গোপু তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরে ঊর্ধ্বমুখে বলল, ফড়িংটা তো আমার ।

ফড়িং তোমার নয় ভাই । ওরা প্রকৃতির জীব ।

আমাকেও একটা ধরে দাও না ।

ফড়িং কোথা পাবো ?

দাও না ।

জ্বালালে ।

দেবে না তো !

নাতিটিকে কালীকিংকর বড্ড ভালবাসেন । কিংবা আদৌ বাসেন কিনা তা বুঝতে পারেন না সবসময়ে ।

ভালবাসার তত্ত্বটা এই বুড়োবয়সে এসে আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিচ্ছেন কালীকিংকর । ছেলেবয়সে ভালবাসা যেমনটা ছিল, জোয়ান বয়সে তার খানিকটা বদল ঘটল । আবার বয়স যত ভাঁটিয়ে গেছে ততই নতুন রকম মোড় নিল ভালবাসার নদী । কালীকিংকর এটা টের পান যে, বুকের মধ্যে একবুক ভালবাসা আজও টলটল করছে, কিন্তু কাউকেই এমন পান না যাকে সবটুকু উজাড় করে দেবেন । নেওয়ার মতো পাত্রও তো চাই ।

সুরভি যখন নতুন বউ হয়ে এল, তার দুখানা টলোমলো চোখের দিকে চেয়ে কালীকিংকর একেবারে দেউলিয়া হয়ে ভালবেসে ফেললেন । ওই কিশোরীর মুখখানা বক্ষলগ্ন করে যখন তার শ্বাসবায়ুর মৃদু কম্পন টের পেতেন বুকে তখন

বন কত মধুর বলে মনে হত। পরে ফের এমন হল যে, ওই সুন্দর মুখখানার
ক তাকাতেও রুচি হত না। তারপর একে একে ছেলেমেয়েরা কোন শূন্য
কে, কোন পঞ্চভূতের যোগসাজসে উড়ে এসে জুড়ে বসল। সেই দেবদুর্লভ
চি মুখগুলো, তাদের শ্বাসবায়ুর স্বর্গীয় সুগন্ধ, তাদের অর্থহীন শব্দ এবং ক্রমে
ধো আধো বোল কালীকিংকরের সীমাবদ্ধ বক্ষদেশকে যেন সমুদ্রের মতো
মাহীন ভালবাসায় প্রসারিত করে দিল। কিন্তু কতদিন ? দেখ না দেখ সেইসব
শু লায়েক হল, জানবুঝদার হল, নিজের নিজের মতামত দিতে শুরু করল,
খ মুখে জবাব বা মুখঝামটা দিতে লাগল। এখনও সংস্কারবশে, অভ্যাসবশে
লবাসেন হয়তো, কিন্তু সেরকম তো আর নয়। নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়েছে,
বধান হতে হয়েছে। ছেলেমেয়েদেরও নিজের নিজের কত না সমস্যা, সংকট।
থিবীর বেশির ভাগ সমস্যাই তো ভালবাসা বা না-বাসার।

এই যে গোপুকে ভালবাসেন, কিন্তু কত না সাবধানে ভালবাসতে হয়।
ধখানা বিস্কুট হাতে দিতে গেলেও দুবার ভেবে দেখতে হয় ওর মা-বাপ কিছু
ন করবে কিনা।

শেষ অবধি বুকেব টলটলে ভালবাসা বুকেই শুকোবে। কী করার আছে
লীকিংকরের ? আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় মানবজন্মটাই বৃথা গেল। বয়ে
ল। ভালবাসাই গেল না কাউকে।

দাদু! ওঠো না।

কালীকিংকরের চটকা ভাঙল। বেশ আঁধার করে এসেছে। গোপুর টিফিনের
ময় বুঝি পেরিয়ে গেল। ওর মা চেঁচামেচি করবে। তাড়াতাড়ি উঠতে গেলেন
লীকিংকর।

ভুল হল। ভীষণ ভুল। অস্ফুট কাতর একটা শব্দ করে আবার বসে
ড়লেন। ঠিক বসাও নয়। পড়েই গেলেন একরকম। বিশ্বস্ত বেঞ্চখানা সেই
কায় ভেঙে উল্টে পড়ল না আজও। সামলে নিল। শুধু ঢক ঢক করে শব্দ হল
রদুয়েক। বেঞ্চ সামলাল, কিন্তু কালীকিংকর সামলাতে পারবেন কি ? প্রবল
কটা শ্বাসকষ্ট, বুকে একটা অদৃশ্য রাক্ষুসে থাবার চাপ আর চোখ ভরা অন্ধকার
নুভব করতে করতেও নিবু নিবু চেতনার ভিতরে তাঁর মনে হল, এই বুঝি
ষ। হায়, গোপুটাকে যদি বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে পারতুম! গোপুটাকে···
াবান!

দাদু! দাদু! ও দাদু! আর্তস্বরে তাঁর হাঁটু ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে গোপু।
আস্তে ভাই, আস্তে। সবুর কর। একটু সামলাই। ফিসফিস করে বললেন
নি।

সামলেও উঠলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে স্থির হয়ে থাকতেই বুকের ওপর থেকে থাবাটা সরে গেল ধীরে ধীরে। শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। চোখের অন্ধকার পর্দাটা সরে গিয়ে ভেসে উঠল পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ।

এখন চৌকাঠে বসে থাকা। কোন সময়ে যে চৌকাঠ ডিঙোবেন তার ঠিক নেই।

গোপুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন কালীকিংকর। টুকটুক করে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। এক নিরানন্দ থেকে আর এক নিরানন্দের দিকে। সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর বেশিদিন নয়। যেতে খুব কষ্ট হবে না কালীকিংকরের একঘেয়ে জীবনযাপনের একটু মুখবদল তো ঘটবে। ওপারে হয়তো অনন্ত আঁধার। হোক, তা হোক। এপারেও তো আলো নেই তেমন!

বাইরের ঘরে বড় মেয়ে দেয়া আর জামাই সম্বুদ্ধকে দেখে কালীকিংকর একটু তটস্থ হলেন। বিয়ে হয়েছে মোটে সাত আট বছর। তার মধ্যে বার তিন চার ওদের ডিভোর্সের কথা উঠেছিল। সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়।

জামাই মুখটা কেমন নীরস করে বসে আছে সোফায়, একধারে এবং একা দেয়া সুরভির সঙ্গে ডবল সোফায় বসে কী যেন বলছে নিচু গলায় কালীকিংকরকে দেখে দেয়া তাকাল।

উৎসাহহীন গলায় কালীকিংকর বললেন, কী খবর রে?

ডাক্তারের কাছে এসেছিলাম।

ডাক্তার! কেন, ডাক্তারের কাছে কেন?

ওর পেটের ব্যথাটা তো কমছে না।

কার পেটে ব্যথা?

ওমা, তুমি জানো না নাকি? তোমার জামাইয়ের পেটে ব্যথা হচ্ছে না কিছুদিন যাবৎ?

কালীকিংকর মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে তো কেউ কিছু জানায় না আজকাল। পেটে ব্যথা হচ্ছে কেন?

কেউ ধরতে পারলে তো বলব। কিছুদিন আগে সকালে উঠে জগিং শুরু করেছিল বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। ফ্যাট কমানোর জন্য। অভ্যেস নেই দৌড়োতে গিয়ে পা মচকে একশা কাণ্ড। তিন মাস টানা চলল ব্যথা। এক্স রে হল, ওষুধপত্র মালিশ কিছুতেই কমছিল না। তারপর এক ডাক্তার ঠেসে একগাদা ব্যথার ওষুধ খাওয়াল। একশো পঁচিশটা ট্যাবলেট খেয়েছিল দেড় মাসে। পায়ের ব্যথা কমল বটে, কিন্তু তখন থেকেই পেটে একটা চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছিল। সেও তো আজ তিন মাস। কিছুতেই কমছে না।

কালীকিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কত যে তেজালো ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল। চট করে ব্যথা কমিয়ে দেয়, কিন্তু ওষুধের বাড়তি তেজ শরীরের আব একটা বিপত্তি বাঁধিয়ে তোলে। জামাইয়ের দিকে একবাব চেয়ে দেখলেন। চেহাবাটা শুকিয়ে গেছে। মুখটায় কেমন বিবর্ণ ভাব। মাথা নেড়ে বললেন, পায়ের ব্যথা তবু ভাল ছিল। পেটের ব্যথা ভাল নয়।

সেই জন্যই তো ভাবনা হচ্ছে। বড ডাক্তার দেখাচ্ছি, তবু কেউ কিছু ধরতে পাবছে না।

দেযা সম্বুদ্ধেব দিকে তাকাচ্ছিল। চোখে মায়া, কোমলতা, গভীর মমতা দেখতে পাচ্ছিলেন কালীকিংকর। চোখের ভুলও হতে পারে। কিন্তু আগের মতো যে আকচা-আকচি নেই তা অনুভব করতে পারছিলেন।

দেয়া মাঝে মাঝে এসে তো কেঁদে পড়ত বাপের বাড়িতে, মা, আর পারছি না। ঠিক এবার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেবো।

জামাইও এসে মাঝে মাঝে শাসিয়ে যেত, খোরপোষ দেবো, মেয়েকে আপনাদের কাছেই রাখুন।

বড় অশান্তি গেছে কযেকটা বছব। সবচেয়ে মুশকিল হল, সেই অশান্তি প্রশমনে কালীকিংকরের কিছুই করার ছিল না। ছেলেমেয়ে তাঁরই বটে, কিন্তু গোটাগুটি তাঁরও নয়। প্রজন্মের ফারাক আছে। ভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে, শিক্ষাদীক্ষা আছে। ওদেব ভাল মন্দ তিনি বুঝবেন কী করে ? শুধু মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে বলে দুঃখ হত।

আজ মনে হল, জামাইয়েব পেটেব ব্যথাটা একদিক দিয়ে মঙ্গলপ্রদই হয়েছে। বিপদ-আপদ না এলে মানুষ জীবনের বাড়তি ফেনাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে না।

কী করব বাবা ? ভারী অসহায় ভাবে জিজ্ঞেস করল দেয়া।

কালীকিংকর বসলেন। হাঁফ-ধরা ভাবটা এখনও রয়েছে। শরীরটা দুর্বল। কোঁচাটা তুলে কপালের ঘাম মুছে বললেন, ডাক্তার কিছুই বলতে পারছে না ?

না। বাব বার এক্সরে করাচ্ছে। ব্লাড ইউরিন টেস্ট করাচ্ছে। বলছে, ব্যথা-ট্যথা নয়, সাইকোলজিক্যাল।

সম্বুদ্ধ এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবার চোখ খুলে ক্লান্ত গলায় বলল, সব বোগাস। পেটের ব্যথা সাইকোলজিক্যাল হলে দুনিয়ার সব রোগই তো সাইকোলজিক্যাল।

ব্যথাটা কোন পেটে হয় তোমার ? ওপর-পেটে না তলপেটে ?

সম্বুদ্ধ তেতো গলায় বলে, বুঝতে পারি না। প্রথমে পিঠের দিকটায় ব্যথা

ওঠে। তারপর সমস্ত পেট-পিঠ জুড়ে ব্যথা হতে থাকে। শুতে গেলেই ব্যথা।

দাঁড়ালে ?

সম্বুদ্ধ মাথা নেড়ে বলে, দাঁড়ালে বা পায়চারি করলে কম হয।

কালীকিংকরের বুকটা একটু কেঁপে উঠল।

সম্বুদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার ধারণা কবিরাজি বা হোমিওপ্যাথি করালে সেরে যাবে। কিন্তু ও সাহস পাচ্ছে না।

দেয়া মাথা নেড়ে বলল, আগে অ্যালোপ্যাথিটাই ভাল করে হোক। না কি বলো বাবা ? তাতে যদি শেষ অবধি কাজ না হয় তখন দেখা যাবে।

সম্বুদ্ধ বলল, আমি একজন হোমিওপ্যাথের কথা জানি। সিম্পলি ফ্যানটাস্টিক। ক্যানসাবও ভাল করেছে।

কালীকিংকর চুপ করে বসে শুনলেন। কিছুক্ষণ। না, তাঁর কিছু বলাব নেই। জীবন তার নিজস্ব নিযমে চলে। তটভূমি থেকে তাঁব নৌকো তফাত হয়েছে। সামনে ভরা গাঙ। তাঁর পবামর্শ এবা শেষ অবধি নেবে না, তিনি জানেন। পরামর্শ তাঁর কিছু দেওয়ার নেইও।

জামাইয়ের দিকে একবার চাইলেন কালীকিংকর। মেয়েব দিকেও একবার। ওরা ডিভোর্স চেয়েছিল। এখন বোধহয় চায় না। কিন্তু চাইলে ভাল করত। এখন ডিভোর্স না চাইলেও বিচ্ছেদ বোধহয় ঠেকানো যাবে না। দূরাগত এক বেড়ালছানার প্রাণঘাতী মিউ মিউ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। তাঁকে স্পর্শ করে চারধারে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি আর ফড়িং-এর ছেঁড়া পাখনাগুলো, যা তিনি নিজেই ছিঁড়েছিলেন একদা।

কালীকিংকব মাথা নাড়লেন। না, জামাইবাবাজীবনের অবস্থা তিনি খুব ভাল বুঝছেন না।

সুরভি এতক্ষণ কথা বলেননি একটাও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, বিড়বিড় করে কী বকছো বলো তো ?

আমি ! কই না তো !

বুড়োবয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি ?

কালীকিংকর আবার বুকে চাপ অনুভব করলেন একটু। শরীরটা নিয়ে কী যে করবেন, বুঝতে পারেন না। এত বেচাল, এত অচল, এত পলকা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার যে কী অর্থ !

সুরভি উঠে কাছে এসে চাপা গলায় বললেন, একটু দোকানে যাও। জামাই এসেছে, তার সামনে ধরে দেওয়ার মতো কিছু নেই। একটু মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে এসো।

কালীকিংকর উঠলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে আর-এক রক্তের সম্পর্কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁব ছোট ছেলে অমল। ডাকনাম জোজো। রক্তের সম্পর্ক বটে, কিন্তু আত্মিক সম্পর্ক কিছুই নেই। আজকাল কথাবার্তাই হয় না। কিরকম জীবন যাপন করছে কে জানে। বেশ জোরালো পায়ে গুমগুম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল জোজো। ছেলেকে পথ দেওয়ার জন্য কালীকিংকব দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন। পেরিয়ে যেতে যেতে জোজো একবার তাকাল মাত্র। বাপ আর দেয়াল বোধহয় আলাদা করে চিনতে পারল না।

আর নিজের বাবার প্রতি আজও কী আকণ্ঠ পিপাসা রয়ে গেছে কালীকিংকরেব। বাবাব কথা ভাবলে আজও মনটা কেমন দ্রব হয়ে গলে যেতে থাকে। বাবা যেন এক অফুরান উৎস। নতুন করে রোজ মনে পড়ে যায় তাঁকে।

কালীকিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নামতে লাগলেন। ভাবলেন, এরা সব কারা? এরা সব কারা?

জোজো ঘরের দরজায় পৌঁছে কী ভেবে যেন ফিরে এল সিঁড়ির মুখে।

বাবা!

উঁ!

একটু দাঁড়াও তো।

কেন?

তুমি কেথায় যাচ্ছো?

দোকানে।

জোজো সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এসে মুখোমুখি হল। তারপর বলল, তোমাকে খুব উইক দেখাচ্ছে। কী হয়েছে বলো তো?

কৃতজ্ঞতায় কালীকিংকরের চোখে প্রায় জল এসে গেল। শরীর যায় যাক, সেটা কথা নয়। কিন্তু তাঁর ছেলের চোখে যে কিছু একটা ধরা পড়েছে সেটাই যে অনেক।

কালীকিংকর মাথা নেড়ে বললেন, না, কিছু হয়নি। বুড়ো বয়সে শরীর তো দুর্বল লাগবেই।

তা নয়। অসুস্থ দেখাচ্ছে।

ও কিছু না।

জোজো কী একটু ভাবল। তারপর বলল, কী আনতে হবে বলো, আমি এনে দিচ্ছি। তুমি রেস্ট নাও গিয়ে।

কালীকিংকর ফের কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলেন। বাস্তবিক তাঁর হাঁটতে কষ্ট

হচ্ছিল। হয়তো পেটে গ্যাস জমেছে। হয়তো প্রেসার বেড়েছে। কে জানে কী। তবে পারতপক্ষে তিনি অসুস্থতার কথা প্রকাশ করেন না। যাওয়ার সময় হয়েই গেছে, এখন আর রোগভোগের পেছনে ডাক্তার ওষুধের খরচ যুগিয়ে মধ্যবিত্ত সংসারে টান ধরিয়ে লাভ কী ?

এই কথাটা তাঁর বড় জামাইকেও পাকেপ্রকারে জানানো দরকার। বাপু হে, তোমার যে রোগ হয়েছে বলে আন্দাজ করছি সেই রোগ শুধু প্রাণেই মারে না, ধনেও মারে। মধ্যবিত্তের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে দেয়। অথচ এমনই ট্রাজেডি, চিকিৎসা না করালেও খারাপ দেখায়। করিয়েও কোন লাভ নেই।

ছেলের হাতে মিষ্টির টাকা দিয়ে কালীকিংকর ঘরে ফিরে এলেন। সুরভির দিকে চেয়ে বললেন, জোজো গেছে।

সুরভি জবাব দিলেন না, ফিরেও তাকালেন না।

কালীকিংকর একটেরে হয়ে একা বসে চেয়ে দেখলেন জামাইকে। এখন মেয়ে আর জামাই পাশাপাশি বসে গুনগুন করে কী যেন বলাবলি করছে। ভিতরের ঘরে গোপুকে খেতে বসিয়েছে ঝি বীণা। দুজনে কী যেন একটা মৃদু ঝগড়া হচ্ছে। বীণাই দেখাশোনা করে গোপুর। সারাদিন বউমা তো থাকে না। গোপু বোধহয় খেতে চাইছে না। বীণা ধমকাচ্ছে।

ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে বীণাকে একটু বকে দেন। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। বীণা অনুর খাস ঝি। দাপট খুব। মুখে মুখে চোপা করতে ছাড়ে না।

কালীকিংকর এখন আর কাউকেই কিছু বলতে চান না। সংসার তার নিয়মেই চলবে। তাঁর নিয়মে নয়।

তিনি উঠলেন।

বাবা, কোথায় যাচ্ছো ?

ভিতরে।

কী করব বলো তো !

কী করবি ?

তোমার মন কী বলছে ?

কালীকিংকর একটু হাসলেন। তারপর বললেন, এই বিজ্ঞানের যুগে ওসব আর কী প্রশ্ন ? ভাল ডাক্তার দেখা।

আমার যে ভীষণ ভয় করছে। সারা রাত ঘুমোতে পারে না। কত সেক-টেক দিই।

সেবা কর, খুব সেবা কর। এইসব বিপদ-আপদের ভিতর দিয়েই তো সম্পর্ক পাকা হয়।

কিন্তু ভাল হবে তো!

হবে না কেন?

আশীর্বাদ কোরো।

সুরভি শুনছিলেন। এবার ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, শুনলি তো, খুব সেবা করতে বলছে তোর বাবা। তার মানে ওঁকে সেবা করা হয় না।

কালীকিংকর সুরভিকে জানেন। ক্ষেপে গেলে জামাই কুটুম মানেন না। যা তা বলে দেন। শঙ্কিত হয়ে বললেন, না, আমি সেরকম ভেবে বলিনি। যাই, শরীরটা আজ ভাল নেই।

কে জানে কেন, আজ দেয়া হঠাৎ তার বাপের পক্ষ নিয়ে মাকে একটু ধমক দিল, কেন মা, বাবাকে অমন করে বলছ.? বাবা তো ঠিকই বলেছে। বাবার সব কথাই তুমি ঘুরিয়ে নাও।

সুরভি আর কথা বাড়ালেন না। কালীকিংকর ভারী কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে লাগলেন মেয়ের প্রতি।

বস্তুত সংসারে কালীকিংকরের পক্ষ নেওয়ার মতো লোক কেউ নেই। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বউ, কেউ নয়। কারণও আছে। এই সংসারটা যে কোনওদিনই মাথা তোলা দিয়ে দাঁড়াতে পারল না, মাজাভাঙা দ হয়ে রইল, তার জন্য তিনিই দায়ী। টাকা হল সংসারের সবচেয়ে বড় নিয়ামক। কিন্তু এও সত্য যে, দরিদ্র একজন লোক যদি ব্যক্তিত্ববান, পুরুষকারবিশিষ্ট, উদ্যমী, সৎ ও কর্মপ্রাণ হয় তবে তার সংসারও শক্ত ভিতের ওপর গড়ে ওঠে। কালীকিংকর দুদিক দিয়েই ব্যর্থ হলেন।

প্রথমত তাঁর বাবার মৃত্যুর পর যখন নাবালক অবস্থায় তিনি ও তাঁর মা ব্যবসার হাল ধরলেন তখন কোথা থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় উটকো পাওনাদার এসে হাজির হতে লাগল। তারা বিবিধ কাগজপত্রও ঋণের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দাখিল করল। ভুয়া অংশীদারও এসে হাজির হল জনা দুই। বেশীরভাগ উত্তমর্ণই বাঙালী। তারা যে খুব সুবিধে করতে পেরেছিল এমন নয়। কিন্তু রাতের ঘুম, মনের শান্তি এবং ব্যবসার নিরাপত্তা খুব সাফল্যের সঙ্গে কেড়ে নিয়েছিল। ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল যখন তাঁর বাবার কয়েকজন পুরোনো কর্মচারীও এসে শত্রুপক্ষের হয়ে সাক্ষ্য দিতে লাগল। কালীকিংকরদের পক্ষেও কয়েকজন পরামর্শদাতা এসে অযাচিতভাবে জুটে গেল, যারা প্রকৃতপক্ষে শত্রুপক্ষেরই লোক। এক নাবালক এবং এক স্ত্রীলোককে পথে বসানোর পক্ষে যথেষ্ট আয়োজন। কালীকিংকর এও জানেন যে সেই দুর্দিনে তাঁদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও নিশ্চয়ই কয়েকজন ছিল। কিন্তু সেই ডামাডোলে তাদের চিনতে

পারা যায়নি। তাঁর বাবার মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যে ব্যবসা লাটে উঠল। হাতের পাতের যা ছিল তাই দিয়ে মায়ে-পোয়ে বেঁচে ছিলেন মাত্র। কালীকিংকরের যেটা সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেল এই ঘটনায়, তা হল, মানুষকে আর তিনি সহজে বিশ্বাস করতে পারতেন না। বিশ্বাসযোগ্যকেও না। উপরন্তু তাঁর মানসিক ভারসাম্যও এই ধাক্কায় কিছু নড়বড়ে হয়ে থাকবে। পিতার জন্য শোক, অর্থক্ষতি এই দুটি ধাক্কা নাবালকের পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল।

তাঁর বাবার এক কর্মচারী ছিলেন গুরুচরণ। শোনা যায়, এঁর কিছু হাতটান ছিল। তাঁর বাবা একসময়ে এঁর হাতেই ব্যবসার লাগাম ধরিয়ে দিয়ে নিজে যেতেন পূর্ববঙ্গে, চাষীদেব কাছ থেকে পাট কিনতে। সেই সুযোগে ইনি নিজেরটা গুছিয়ে নিতেন। তাঁর বাবা সব জেনেও গুরুচরণকে তাড়াননি। কিছু কারণ যে ছিল তা বোঝা গেল দুর্দিনে, গুরুচরণ আব সকলের সঙ্গে হাত মেলায়নি। তিনি এই নাবালক ও তাঁর মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন. তাতে যে খুব একটা সুরাহা হয়েছিল তা নয়, কিন্তু কালীকিংকরকে তিনি আবার ব্যবসা শুরু কবাব জন্য প্ররোচনা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করলেন।

বলতে কি, গুরুচরণের প্রাণান্ত চেষ্টাতেই আবার কিছু আশার আলো দেখা যেতে লাগল। চটকলগুলিতে আবার কিছু কিছু মাল সরবরাহের বরাত পেতে লাগলেন কালীকিংকর। গুরুচরণ ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। উপকারের বিনিময়ে তিনি তাঁর একটি মেয়েকে যথোচিত কৌশলের সঙ্গে কালীকিংকরের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। সেই মেয়েই এই সুরভি।

কঞ্জুস, স্বার্থপর, অর্থকেন্দ্রিক গুরুচরণের অন্তঃকবণেও কিছু কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল ঠিকই, কিন্তু কৃতজ্ঞতার পিছনে কতখানি কন্যাদায় কাজ করেছিল তা আজ বোঝা শক্ত। সেই বিয়ের ছ' মাসের মধ্যে গুরুচরণ মারা যান।

কালীকিংকর সেই থেকে একরকম অভিভাবকহীন। সুরভি পরামর্শ দিল, এখন বাবা নেই। কে তোমাকে চালাবে ? ব্যবসার বুদ্ধি তোমার নেই। তুমি চাকরি খোঁজো।

কিন্তু বাঙালীর দারিদ্র্য ঘোচাতে এবং বদনাম দূর করতে তাঁর বাবা যে পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ব্যবসাকে গ্রহণ করেছিলেন তা কালীকিংকর কী করে ছাড়বেন ? সুতরাং তিনি চিমটি খেয়ে লেগে রইলেন, সুরভির অনেক গঞ্জনা এবং অপমান সয়েও। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেন না, আর এই জেদই তাঁর কাল হল।

আজ যে এই সংসারে তাঁর কোনো সম্মান নেই তার জন্য দায়ী সুরভিই। আর কিছু না পারুন নিজের স্বামীকে ছেলেমেয়ের কাছে তিনি নানাভাবে হেয় করে দিতে পেরেছেন। সেটা এতদূর হয়েছে যে, কালীকিংকরের মাঝে মাঝে

মনে হয়, তিনি পার্কের বেঞ্চখানায় দাঁত ছবকুটে মরে পড়ে থাকলে এরা বোধ হয় কয়েকদিন টেবই পাবে না যে, সংসারে একজন লোক কম পড়ছে।

দেয়া এসে বাপের হাত ধরে সোফায় বসাল। নিজে সোফার পাশে মেঝেয় বসে মুখখানি তুলে বাপের দিকে চেয়ে বলল, তোমার কী মনে হচ্ছে একটু বলবে বাবা ?

কালীকিংকর অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, কী মনে হবে ?

তোমার জামাইয়েব অসুখের কথা বলছি।

ডাক্তার তো দেখাচ্ছিস। দেখ তারা কী বলে!

তোমাব মুখের কথায় আমার বিশ্বাস বেশী। তুমি তো ঠিক আর পাঁচজনের মতো সংসাবী পাজি লোক নও। তুমি কখনও মিথ্যে কথা বলোনি, কারও সঙ্গে ঝগড়া কবোনি, আমাদেব ভাল কবে শাসন করোনি। আমাব বিশ্বাস তোমার মধ্যে ভগবান আছেন।

কালীকিংকর এত অবাক হয়ে যান যে, তাঁর মুখে কথাই ফোটে না কিছুক্ষণ। একেবারে শেষ বয়সে এসে নিজেব সন্তানের কাছে এই প্রথম ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পেয়ে তিনি বিহ্বল বোধ কবতে লাগলেন। সুরভি তো ঠিক এরকম শেখায়নি ওদের। তিনি ওদের অন্যরকম চশমা পরিয়ে রেখেছিলেন। এখন কি সাবালক হয়ে ওদের সেই চশমা খসে পড়ে যাচ্ছে ?

কথাটা মিথ্যেও নয। তিনি বরাবব সত্য কথাই বলে আসবার চেষ্টা করেছেন। পাজি লোক তিনি নন। ঝগড়া করতে তিনি আজও জানেন না। তিনি শাসনতর্জন সর্বদাই পরিহার করেছেন। কিন্তু এগুলো তাঁর গুণ বলে কোনওদিনই অভিহিত হয়নি। বরং দুর্বলতা হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে নিজেব ভাবাবেগটাকে সংযত করতে একটু সময় নিলেন কালীকিংকর। তাবপর নরম স্বরে বললেন, কার কী মনে হল তা নিয়ে কি এই বিজ্ঞানের যুগে কেউ মাথা ঘামায ?

বিজ্ঞানের যুগ না হাতি। এই তো বিজ্ঞান বিজ্ঞান শুনি অথচ সামান্য একটা পেট ব্যথা কেন হচ্ছে তাই এতগুলো ডাক্তার ধবতে পারছে না। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস নয়, কলিক পেন নয়, স্টোন নয়, তা হলে কী ? আমার বাপু, ডাক্তারি চিকিৎসার ওপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয বাবা, আলসার ? ডাক্তাররা তো বলছে, তাও নয়।

কারও অসুখ-বিসুখ হলে আত্মীয়স্বজনের কি মাথার ঠিক থাকে রে ? কত কী মনে হতে থাকে। ভাল কোনও হোমিওপ্যাথ যদি পাস তো দেখা না!

বাকী রেখেছি নাকি ? হোমিওপ্যাথি কবিরাজী জরিবুটি তাবিজমাদুলি

জলপড়া সব চলছে। সেইজন্যই তো ভয় লাগে আজকাল।

জোজো ফিরল। হাতে মিষ্টির বাক্স। তাব পিছু পিছু সুরভি উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন।

সম্বুদ্ধ এতক্ষণ চোখ বুজে বসে ছিল। হঠাৎ চোখ খুলে বলল, আপনার কাছে আমারও অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। রাগেব মাথায় আপনাকে অপমানও করেছি।

কালীকিংকর শুনেছেন, সব মানুষেরই মৃত্যুর আগে একটা সুসময় আসে। স্বল্পস্থায়ী. ক্ষণেকমাত্র. কিন্তু আসে। এই কি সেই-সেই সুসময়? জামাই যে তাকে একাধিকবার অপমান করেছে তা একরকম ভুলেই গেছেন তিনি। অপমান হতে হয়েছে মেয়েব জন্যই। ক্ষমা তৎক্ষণাৎ করে দিয়েছেন, কারণ রাগ পুষে রাখার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অপমানের বোধটাও গেছে ভোঁতা হয়ে।

জামাইযের প্রতিও খুব কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন কালীকিংকর। কিন্তু এই সব ভাল ব্যবহার পেয়ে তাঁর রক্তচাপটা কি ঠেলে উঠছে? কেমন ঝিমঝিম করছে মাথা! কোনওরকমে অস্ফুট স্বরে বললেন. না, না, কী যে বলো! তুমি কি আমার সন্তানের চেয়ে আলাদা! অপমান আবার কী? এসব আমি মনে রাখিনি।

সম্বুদ্ধ বরাবরই তেডিয়া এবং বদমেজাজী ছিল। জামাইয়ের ভয়ে বেশ একটু কাঁটা হয়ে থাকতে হত তাঁদের। রোগভোগ কী আশ্চর্য জিনিস! সম্বুদ্ধকে এর মধ্যেই ঝেড়ে ফেলে ছেনে মেখে নবম কাদার তাল করে ফেলেছে। চোখের নেই দীপ্তি নেই, কথায় কথায় রাগ নেই, মেজাজ নেই,ভুলোভালা মানুষের মতো দেখাচ্ছে।

সুরভি প্লেট সাজিযে ঘরে এলেন। কালীকিংকরের দিকে চেয়ে চোখের কী যেন একটা ইশারা করলেন, কালীকিংকর ভাল বুঝতে পারলেন না। তবে সভয়ে উঠে পড়লেন।

ভিতরের ঘরে গোপু খেলনা সাজিয়ে বসেছে মেঝেয়। ঝি-মেয়েটা তার কাছে বসা। গোপুর মা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। ফিরলেই বাড়ির গোটা আবহাওয়া পাল্টে যাবে। তেমন একটা বারুদের গন্ধ তখন ভাসে এ বাড়ির বাতাসে।

যদিও ভাড়াটে বাড়ি, তবু এ বাড়িতে বেশ কয়েকখানা ঘর তাঁদের দখলে। অন্তত চারখানা শোওয়াব ঘর আছে। একখানা বসবার ঘরও। একখানা ছোটো কুঠুরী আছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। সবচেয়ে খারাপ ঘর। উত্তরে একটা ছোট্ট জানালাই একমাত্র আলো হাওয়ার পথ। বুকচাপা, চিলতে সেই ঘরখানা

কালীকিংকর স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। আঁর কেউ দাবীদার নেই, এক কথা। আর এই ঘরখানায় তিনি একা থাকতে পারবেন বলেও।

আসবাব বলতে একখানা তিন ফুট চওড়া চৌকি। ছোট্টো একটা নড়বড়ে টেবিল, একখানা লোহার চেয়ার। টেবিলে খবরের কাগজের ঢাকনা, চেয়ারে পুরোনো একখানা কাঁথা ভাঁজ করে পাতা। কালীকিংকরের জামাকাপড় কোনওদিনই বেশি ছিল না। যা দু-চারখানা আছে তা দেয়ালের একটা খাটের র‍্যাক থেকে ঝুলিয়ে রাখা।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে নিজস্ব গামছাখানা দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে কালীকিংকর টেবিলের সামনে বসলেন। ডায়েরী প্রস্তুত। প্রস্তুত তাঁর কলমও। এই আত্মজীবনী কোনওদিনই ছাপা হবে না, কেউ পড়বে না, পৃথিবীর কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না। তবু কালীকিংকর এই ডায়েরী লিখতে লিখতেই ভিতরে ভিতরে জীবনের অনেক গোপন জানালা দরজা খুলে ফেলেন, দেখে নেন সংসারের নানা সত্য, নানা অপরূপ দৃশ্যাবলী। তাঁর বাবা এইটি শিখিয়েছিলেন তাঁকে, ডায়েরী লিখো, তাতে স্মৃতি প্রখর হবে, অনেক পুরোনো অভিজ্ঞতাকে জীবনে কাজে লাগাতে পারবে।

পৃষ্ঠার মাথায় তারিখ বসিয়ে কালীকিংকর লিখতে লাগলেন : আজ এ কী হইল বা হইতেছে ? আমার আত্মীয়রা কি আমার পুনর্মূল্যায়ণে ব্রতী হইল ? তাহারা কি এতদিনে বুঝিতে পারিতেছে যে, লোকটা ততদূর খারাপ নহে যতদূর খারাপ বলিয়া তাহাদের শিখানো হইয়াছিল ?

না, আজ আর নিজেকে লইয়া নাড়াচাড়া করিব না। মাথাটা ঠিক নাই। আজ যাহা হইল তাহা থিতাইয়া গেলে আজিকার কথা লিখিব। শুধু বলি, আমার জামাইবাবাজীবনের অবস্থা ভাল ঠেকিতেছে না। পুরানো ডায়েরী খুঁজিলেই হতভাগ্য সোমেন্দ্রনাথের কথা পাওয়া যাইবে। প্রায় একই ঘটনা, একই লক্ষণ। সোমেন্দ্রনাথের ক্যানসার ধরা পড়িয়াছিল মৃত্যুর মাত্র চারি মাস আগে। কোনও না কোনওভাবে মানুষকে একদিন মরিতেই হয়। কিন্তু কোনভাবে সেইটাই সমস্যার কথা। শেষদিকে সোমেন্দ্রনাথকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দিনে চারিপাঁচশত টাকা ব্যয় করিতে হইত। ব্যয় করিয়াও তাহাকে কিছুমাত্র আরাম দেওয়া যাইত না। সারাক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট ও আর্তনাদ করিয়া সে এমন এক বিকটভাবে বাঁচিয়া থাকিত যাহা চতুর্দিকে একটি মৃত্যুর বিভীষিকাকেই ছড়াইয়া দিত।

সোমেন্দ্রনাথ যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল সেদিন আমি তাহার ক্লান্ত, শোকভারাক্রান্ত, মৌন স্ত্রীর মুখখানি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বিগত বৎসর

খানেক যাবৎ এই মহিয়সী যে অলৌকিক সেবাপরায়ণতা, ক্লান্তিহীন পরিচর্যা ও অবিশ্রান্ত সাহচর্যে স্বামীকে চতুর্দিক দিয়া ঘিরিয়া ছিল আজ তাহার শোকের গভীরতা মাপিব তাহার সাধ্য কী ? কিন্তু পাপচক্ষুতে আর একটা জিনিসও ধরা পড়িয়াছিল যে ! আমি স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সোমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীর মুখে ও চক্ষে একটি স্বস্তির আভাস। এবার তিনি রাতে ঘুমাইতে পারিবেন, উৎকণ্ঠা ও অপেক্ষা হইতে মুক্তি পাইবেন, আর পাইবেন নিবন্তব এক অপবিমিত অযথা ব্যযের হাত হইতে উদ্ধাব।

বাস্তবিক সোমেন্দ্রনাথের সংসারের রসকষ, জমা অর্থ, স্ত্রীর গহনা সকলই সেই রোগ শুষিয়া লইয়া সংসাবের একটি ছিবডা মাত্র ফেলিয়া রাখিযা গেল।

আজ আমি দেয়াকে কী পবামর্শ দিব ? বলিব কি, বাপু হে, রোগটি যদি শীঘ্র ধরা পডে তবে আর অনর্থক ওই হাতি পোষার খরচে যাইও না। লাভ নাই। বরং যতদূর সম্ভব তাহাকে ঘুম পাডাইয়া বা অবশ কবিযা রাখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিও। হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজী করিতে পার। কিন্তু বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা করিও না। উহা তো মানুষটাকে বাঁচাইযা রাখা নহে, তাহার যন্ত্রণাকে প্রলম্বিত করা মাত্র।

না, এইসব কথা ভদ্রতার খাতিবে, মানবতার খাতিয়ে বলা যাইবে না। আমাকে মুখ বুজিয়া থাকিতে হইবে।

যে-রোগের ওষুধ নাই, চিকিৎসা নাই, সেই রোগেব একমাত্র নিদান তো মৃত্যুই। তবে কেন এখনও মার্সি কিলিং বা করুণা-হত্যা চালু হয় না তাহাও বুঝি না। আমার তো মনে হয় মার্সি কিলিং-এ বেশীব ভাগ রোগীও আপত্তি করিবে না। মানুষ নিত্য কত মানুষকে মারিতেছে, আর এই প্রয়োজনীয় হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত কবিতেই তাহাব যত চক্ষুলজ্জা, যত সংকোচ আর ধর্মভয় ?

অনেকেই হযতো বলিবেন রোগযন্ত্রণাও বা মানুষ না সহিবে কেন ? তাহাও তো কর্মফল। তাহাও তো জীবনেরই সারাৎসার।

কী জানি কী ! পৃথিবীতে কত সমস্যাই সমস্যা রহিয়া গেল। শিশুর যখন ক্যানসার হয় তখন তাহাও তাহার কর্মফল ইহা আমি ভাবিতে পারি না। এইসব রোগভোগ দেখিলে মাঝেমাঝে মনে হয়, ঈশ্বরকে যাহারা বিশ্বাস করে না তাহারা ঠিকই করে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই।

সম্বুদ্ধ একসময়ে প্রায়ই আসিয়া আমাদের কাছে দেয়া সম্পর্কে ক্রুদ্ধ তর্জন গর্জন ছাড়িত। কানাঘুষা শুনিযাছি, আমার পুত্রবধূও নাকি আড়ালে এবং গোপনে তাহাতে ইন্ধন জোগাইত। হইবে। সংসারের পাঁক অতীব গভীর। সম্বুদ্ধ আমাকে প্রায়ই বলিত, আপনারা ছোটোলোক, ইতর, অশিক্ষিত,

আনকালচার্ড। আপনাদের মেয়ে আর কত ভাল হবে! আমাদের পরিবারে এসব মেয়েছেলে অচল। আরও কত কী।

আজকাল যে মাত্রায় বধূদের হত্যা ও আত্মহত্যা বাড়িতেছে তাহা মনে করিয়া আমি বা এই পরিবারের কেহ সম্বুদ্ধব কথার তেমন প্রতিবাদ কবি নাই। তাহার অভিযোগ একরকম স্বীকার করিয়াই লইয়াছি। সুতরাং আজ সে যখন কথাটা কবুল করিল যে, আমাকে অপমান করিয়া কাজটা সে ঠিক করে নাই, তখন কিন্তু খুশি হইতে পারিতেছি না। কেবল ভাবিতেছি, এক অতীব পবাক্রমশালী রোগ আসিয়া মানুষটিকে দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন করিয়া দিয়াছে।

তবু আশীর্বাদ করি, আয়ুর ফুরানো দিনগুলিতে উহারা পরস্পব বিবাহিত জীবনের বিরহতাড়িত প্রেমটুকু উপভোগ করুক।

অবশ্য এখনও জানি না সম্বুদ্ধের প্রকৃতই কী হইযাছে।

নেতার মৃত্যু, দুর্ঘটনা ও জোজো

আজকাল আর ঘাড়ে করে নিতে হয় না। টেম্পো বা লবিতেই দিব্যি মড়া চলে যায় শ্মশানঘাটে। অংশুদার কপাল ভালই। তার ভাগ্যে জুটেছে একটি বৃহৎ, প্রায় নতুন টাটা মার্সিডিজ ট্রাক। মাল নেওয়ার বিপুল পরিসর। মাঝমধ্যিখানে একটা ট্যাঙট্যাঙে মড়ুনে খাটে রোগা পাতলা একটুখানি মানুষটা শোয়া, বুকের ওপর কিছু মালা, শিয়রে যথারীতি গা-বমি-বমি করা গন্ধের একগুচ্ছ ধূপ জ্বালানো। সস্তা সেন্টও ছড়ানো হয়েছে দেদার। ওই গন্ধটাই কাহিল করে ফেলছে জোজোকে। তার গন্ধের অ্যালার্জি আছে। অপছন্দেব গন্ধ হলে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, সর্দি লেগে যায়।

একবার ট্রাক থেকে নেমে পড়ার কথাও ভেবেছিল জোজো। সুহৃদ খপ করে হাতটা ধরে ফেলে গম্ভীর মুখে বলল, তা হয় না। অংশুদা আফটার অল তোর পলিটিক্যাল গুরু।

গুরু কিনা বলা মুশকিল। তবে একথা ঠিক একদা জোজো কিছুদিন সাকরেদী করেছিল অংশুদার। তাকে পলিটিকস কবা বলে না। বেকার বসে ছিল, অংশুদার সঙ্গে জুটে একটু গা গরম করা হত। পোস্টার লিখত, সাঁটত, ভলনটিয়ারি করত, চাঁদা তুলত। এর বেশী কিছু নয়। অংশুদা যাকে বলে ডেডিকেটেড মানুষ। শয়নে স্বপনে জাগরণে পার্টি ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। সারাদিন পার্টির কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না মুখে। জোজোর মনেই পড়ে না,

কখনও অংশুদার মুখে হেমা মালিনী, মোহনবাগান, রবিশংকর, জীবনানন্দ দাশ ইত্যাদি শব্দগুলো শুনেছে কিনা। সবচেয়ে বড় কথা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য কিছুই গোছায়নি। এরকম মানুষ সহজেই যুবকদের টেনে নিতে পারে। নিয়েছিলও। অংশুদা কখনও তার অনুগামী যুবকদের বিড়ি বা দেশলাই আনতে দোকানে পাঠায়নি, জলের গেলাসটা এগিয়ে দিতে বলেনি, তাদের কাছে নিজের কাঁদুনি গায়নি।

মাত্র পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়সে টেঁসে গেল-লোকটা। শরীরটায় প্রায় কিছুই ছিল না। বোগ টোগ ছিল কিনা বোঝা যেত না. ডাক্তার দেখায়নি কখনও। কাল রাতে কোন বন্ধ কারখানার কর্মীরা বাড়িতে এসেছিল। তাদেব সঙ্গে মিটিং করতে করতেই ঢলে পড়ল বুক চেপে ধরে। ডাক্তার এল আধঘণ্টা বাদে। নাড়ী ধরেই বলল, হয়ে গেছে।

অংশুদাব সঙ্গে তাব অন্দরমহলে আরও একজন লোক বাধ্যতামূলকভাবে আত্মোৎসর্গ করে যাচ্ছিলেন এতদিন ধরে। তিনি অংশুদাব বউ। ভদ্রমহিলা এসে অংশুদার মৃতদেহেব সামনে যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁর শ্রীহীন মুখে চিরস্থায়ী বিষণ্ণতাটা ছাড়া আর কোনও ভাবান্তর দেখেনি জোজো। এমন কি আঠারো বছর বয়সী ছেলেটা অবধি কাঁদল না। চুপচাপ এসে মুখ গোমড়া করে দাঁড়াল। বোঝাই যাচ্ছিল, পার্টি-পার্টি করে অংশুদা এদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কটা গড়ে নেওয়ার সময় পায়নি।

অংশুদার জন্য শোকবিহ্বল কোনও মানুষকেই দেখতে পাচ্ছে না জোজো। পার্টি থেকে আনুষ্ঠানিক শোক জানানো হয়েছে, পাঠানো হয়েছে মালা, কমরেডরা বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছে। শ্মশানেও অনেকে যাবে। অনেকে শবানুগমনও করছে। কিন্তু শোকের তেমন চিহ্ন কোথাও নেই। শুধু সময়োচিত গাম্ভীর্য আছে।

জোজো খুব চাপা গলায় সাহস করে বলেই ফেলল, এরকম সেলফ স্যাক্রিফাইসের কোনও মানেই হয় না।

সুহৃদ বোধহয় এরকম কোনও মন্তব্য শুনবে বলে উৎকর্ণ হয়েই ছিল। সে পার্টির থিওরেটিশিয়ান। ভাল তার্কিক। লরির কানায় বিপজ্জনকভাবে বসে থেকেও সে যথেষ্ট উষ্মার সঙ্গে বলল, মানেটা তারাই বোঝে যারা স্যাক্রিফাইস করে। মানুষের জন্য স্যাক্রিফাইস যদি করতিস তবে বুঝতিস।

জোজো সুহৃদের জ্ঞানকে ভয় খায়। অনেক জানে সুহৃদ। তাই সে প্রথমটায় কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

লরির সামনে দুটো লাঠিতে আটকানো কাপড়ের ওপর বড় অক্ষরে লেখা

"কমরেড অংশু দে অমর রহে।" জোরালো হাওয়ায় কাপড়টা পালের মতো ফুলে আছে পিছন দিকে। "অমর রহে" কথাটিকে কেমন জোলো, মিথ্যে এবং বীভৎস লাগছে তখন! এই তো অংশুদা খাটের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে, ওর "অমরত্বটা" তাহলে কোথায়? দেশ ওকে মনে রাখবে? পার্টি ওকে মনে রাখবে? নাকি জনগণই স্মরণ করবে? অংশুদা যে দরের নেতা ছিল তাতে কারোই ওকে মনে রাখার কথা নয়। অথচ একটা জীবন তো উজাড় করে দিয়ে গেছে নিজেকে! কিন্তু কিসের জন্য?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জোজো বলল, এই স্যাক্রিফাইসটা মোটেই মানুষের জন্য ছিল না। ছিল পার্টির জন্য।

পার্টি মানেই মানুষ। মানুষের জন্যই পার্টি। মানুষ নিয়েই পার্টি।

জোজো জানে সে তর্কে এঁটে উঠবে না। কিন্তু তবু খুব দুর্বল, আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলল, যারা পার্টি করে তারা উল্টো পার্টির লোককে মানুষ বলেই মনে করে না। পার্টির বাইরে যারা আছে তারা হয় ননএনটিটি, না হয় এনিমি। মানুষের জন্য পৃথিবীতে কোনও পার্টিই নেই।

এ কথায় সুহৃদ হাসল। ইঁদুরকে বাগে পেয়ে বেড়াল কখনো হাসে কিনা কে জানে, তবে হাসলে বোধহয় এরকমই হাসত।

কিন্তু সুহৃদকে মুখ খুলতে দিল না জোজো। একটু দম ধরে থেকেই সে বলল, অংশুদাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। অংশুদা পার্টির বাইরে যে একটা জগৎ আছে সেটার কথা জীবনে ভাবেনি। পার্টি উঠতে বললে উঠত, পার্টি বসতে বললে বসত। হাইকমাণ্ডের নির্দেশকে ঈশ্বরের অনুশাসনের মতো মানত। কোনও ব্যাপারে পার্টি রাতারাতি মত পাল্টে ফেললে অংশুদারও মত পাল্টে যেত। নিজের মত বলতে অংশুদার কিছু ছিল না। টোটাল ডেডিকেশন মানে কি টোটাল ব্রেনওয়াশ? কে জানে! কিন্তু অংশুদা মোটেই মানুষের জন্য সেলফ স্যাক্রিফাইস করেনি, করেছে পার্টির জন্য। আর এখন দ্যাখ, পার্টি অংশুদাকে কী দিয়েছে। ফুলের মালা, ধূপকাঠি, সেন্ট, লরিভাড়া আর ঘাটখরচ, সব মিলিয়ে কত হবে?

সুহৃদ চাপা গলায় বলল, ইডিয়ট।

জোজো তার ঘর্মাক্ত মুখখানা তুলে দুর্বল চোখে সুহৃদের দিকে চেয়ে বলল, আমি পার্টি পলিটিক্সকে ঘেন্না করি সুহৃদ। ঘেন্না করি। অংশুদার দিকে চেয়ে দেখ, কী করুণ, কী গাড়লের মতো দেখাচ্ছে লোকটাকে। একটা ভুল জিনিসের জন্য লাইফটাকে নষ্ট করল, জীবনে কোনও সুখভোগ করল না, কাউকে সুখ দিল না, শিল্প সাহিত্য সব কিছুকে উপেক্ষা করে স্রেফ পার্টি করে গেল।

সুহৃদ তার কাঁধে থাবা বসিয়ে বলল, চুপ কর। পরে কথা হবে।

একজন উৎসাহী ছোকরা নতুন একগোছা ধূপকাঠি ধরিয়েছে। ধূপকাঠির তীব্র গন্ধে গা গুলিয়ে পেটের মধ্যে পাক দিল হঠাৎ। জোজো নিজের মুখে হাত চাপা দিল, পাছে বমি করে ফেলে।

কী হয়েছে তোর?

আমার খারাপ লাগছে।

মুশকিলে ফেললি। পকেটে রুমাল আছে? নাকটা চেপে রাখ। এই ধূপকাঠি ফাটি যে কেন জ্বালায় এরা! অবনকশাস ব্যাপার।

খাটের মাথার কাছে অংশুদার ছেলে বিমান বসা। জোজো তাকে দেখছিল, এই ছেলেটার বয়সোচিত অনেক শখ আহ্লাদ ছিল, কিছু চাহিদা ছিল। বাপের কাছে বায়না করলেই বাপ বলত, মায়ের কাছে যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না। মা ছিল অসহায়। ছেলেটা লেখাপড়ায় তেমন ভাল হয়নি, কেমন যেন রুক্ষ, অসহিষ্ণু। অংশুদা ওর প্রকৃত বাবা হয়ে ওঠার সময় পেল না। অথচ সেটা হয়ে ওঠাও তো একজন মানুষের পবিত্র কর্তব্য!

অংশুদার ছেলেটাকে দেখ সুহৃদ। দেখেছিস ওর মুখে কোনও শোকের ছাপ নেই! বরং বাপকে নিয়ে এভাবে শ্মশানে যেতে হচ্ছে বলে ও বেশ বিরক্ত! বিকেলটা ওর মাটি হয়ে গেছে। ওকে গোপনে জিজ্ঞেস করে দেখিস, অংশুদা কখনও ওর হীরো ছিল কিনা। কখনও না। ওর হীরো হয়তো অমিতাভ বচ্চন, হয়তো গাভাসকার, এমন কি রাজীব গান্ধী হওয়াও বিচিত্র নয়।

চুপ করবি না কি! কী তখন থেকে ফালতু বকছিস?

অ্যাসেসমেন্ট রে, অ্যাসেসমেন্ট। অংশু দে-র ডেবিট ক্রেডিট কষছি। ওঃ, ধূপকাঠির গন্ধটা কী বিটকেল! আমার বমি আসছে। আমি নেমে যাই, বুঝলি!

চল তাহলে দুজনেই নামি। হেঁটে হেঁটে যাবো। গন্ধটাতে আমারও মাথা ধরছে।

না, আমি শেষ অবধি যাবো না। আমি কেটে পড়তে চাই।

তাই কি হয়! লোকে কী ভাববে?

ফুটুক শালা লোকেরা। লোক মানে তো সব পার্টিবাজ দু নম্বরীরা। আমি থোড়াই ওদের পরোয়া করি। অংশুদা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন আমাকে কিছু শেখাতে পারেনি, মরে গিয়ে শিখিয়ে দিল। কী শিখলাম জানিস? পার্টি পলিটিক্স হল একটা চক্কর, একটা প্লে অ্যাকটিং। এখানে যে শালা হীরো সে আসলে হীরো নয়, ভিলেন সেও আসলে ভিলেন নয়, যা বলে তা সব মুখস্থ করা কথা। এই যে অংশুদা, লোকটা ভাল ছিল। মিথ্যে কথা এমনিতে বলত না, কিন্তু পার্টির জন্য

বলত। পকেটমার, গুণ্ডা, খুনে, ঠকবাজ লোকদের স্রেফ পার্টির লোক বলে খাতির করত। বউ-বাচ্চাকে বেশী ভালবাসলে পাছে পার্টির ভাগে কম পড়ে যায় সেইজন্য ভালবাসায় ছিপি এঁটে রেখেছিল।

তোর আজ হয়েছে কী বল তো!

আমার বাবাকেও তো দেখছি। বাঙালীর ব্যবসা বাঁচাতে গিয়ে লোকটা স্রেফ ঝুল খেয়ে গেল। ব্যবসা করবে, কিন্তু ঘুস দেবে না, ব্ল্যাক করবে না, দু নম্বর খাতা রাখবে না, ট্যাক্স সব ঠিকঠাক দেবে। বল এভাবে ব্যবসা হয়, না কি সেরকম ব্যবসা করে কেউ দাঁড়াতে পারে? লোকটাকে আজকাল কেউ পোঁছে না, পাত্তা দেয় না, মতামত নেয় না। নন এণ্টিটি। অংশুদার সঙ্গে একটা মিল আছে। এ লোকটাও স্রেফ ঝুল খেয়ে গেল।

নাম জোজো, তোর পক্ষে এ লরিতে আর থাকা বিপজ্জনক। তোর কথা ওরাও শুনতে পেয়ে যাবে। নেমে পড়।

থ্যাংক ইউ। আমি একটু ফ্রেশ এয়ার চাই, মুক্তি চাই।

মস্ত উঁচু লরিটার কানা থেকে জোজো অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দৃষ্টিকটুভাবে লাফিয়ে নামল। মাঝারি যে শোকমিছিলটা নীরবে শবানুগমন করছিল তাদের অগ্রবর্তী কয়েকজন বিরক্তির চোখে তাকে চেয়ে দেখল। ফুটপাথে দাঁড়ানো কিছু লোকজন বুরবকের মতো দেখছিল শবযাত্রা, তারাও দেখল জোজোর প্রায় অ্যাক্রোব্যাটিক অবতরণ।

নেমেই জোজো রাস্তা বদলে ফেলল এবং খানিকটা উদভ্রান্তের মতো হাঁটতে লাগল। তার মাথাটা কেন যেন পাগল-পাগল লাগছে আজ। অংশুদা আজ তার মাথাটা হাঁটকে মাটকে দিয়ে গেছে। এরকম ব্যর্থ জীবনযাপন ও করুণ মৃত্যু সে সহ্য করতে পারছে না।

ল্যান্সডাউন আর এলগিনের মোড়ের কাছে ফুটপাথ বদল করতে গিয়ে অন্যমনস্কতাবশে একটা ছুটন্ত স্কুটারের একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল জোজো। দোষ তারই।

রিফ্লেক্স খুবই ভাল জোজোর। ডান চোখের কোনা দিয়ে স্কুটারটার একটা আঁচ ধরতে পেরেছিল। সময় ছিল না। শরীরটা শক্ত করে কুঁজো হয়ে শুধু ঘুরে দাঁড়াল।

কঠিন একটা ধাতব সংঘাত ঘটল কোমরে।

জোজো ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। আর সেই সঙ্গে একটা স্কুটারও চক্কর খেয়ে বেসামাল হয়ে ফুটপাথের কানায় গিয়ে দড়াম করে ঠেকল।

লেগেছে, তবু তেমন নয়। জোজো কোমর চেপে ধরে খুব ধীরে ধীরে উঠে

দাঁড়াল। তার পায়ের কাছেই স্কুটারওয়ালার হেলমেটটা। নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল সে। তারপর স্কুটারওয়ালার দিকে তাকাল।

'শুয়োরের বাচ্চা' কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল আপনা থেকেই। কিন্তু ভদ্রতাবশে উচ্চারণ করতে পারল না জোজো। কারণ, স্কুটারে ছেলেটার পিছনে একটি ছিপছিপে উজ্জ্বল তরুণী।

যুবকটি ততোধিক উজ্জ্বল। এমন ভাস্কর্যের মতো মুখশ্রী, আয়ত চক্ষু, বুদ্ধিদীপ্ত যুবক বড় একটা চোখে পড়ে না। আহত জোজো তার যন্ত্রণার ভিতর দিয়েও কয়েক পলক এইসব দেখে নিল।

পায়ের সামনেই নীল একটা হেলমেট পড়ে আছে। সেটা কেন যে আপনা থেকেই কুড়িয়ে নিল জোজো তা কে জানে। নিয়ে সে একবার ওঠার চেষ্টা করে, পড়ে, অবশেষে উঠল। তার বমি পাচ্ছে, চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ঘোলাটে আবছা।

লোকজন ছুটে আসছে, জড়ো হচ্ছে। গাড়িটাড়ি থেমে যাচ্ছে। টের পেয়ে জোজো খুব কষ্টে, টালমাটাল মাতালের মতো ফুটপাথের দিকে নিজেকে একরকম টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। হাতে নীল হেলমেট।

স্কুটার থেকে হতভম্ব যুবকটি নেমে এইসময়ে ছুটে আসছিল তার দিকে ছেলেটির মুখে অপরাধবোধ, করুণা।

কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ পেছন থেকে চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, জিমি! কাম ব্যাক! দি ক্রাউড উইল কিল ইউ! লেট আস স্ক্র্যাম! লেট আস স্ক্র্যাম!

ছেলেটা দোটানার মধ্যে পড়ে থমকে গেল হঠাৎ। কলকাতা শহরকে সে হয়তো ভাল চেনে না। শুধু জোজোর দিকে চেয়ে সে অত্যন্ত মরীয়া গলায় চেঁচিয়ে বলল, আই অ্যাম সরি। টেরিব্লি সরি!

তারপর দৌড়ে ফিরে গিয়ে ওস্তাদের মতোই স্কুটারটাকে চোখের পলকে চালু করে ধুন্ধুমার বেগে পালিয়ে গেল।

জোজোকে ধরল এসে জনসাধারণ। ফুটপাথে তুলে একটা টুলজাতীয় কিছুর ওপর বসালে। জোজোর কষ্ট হচ্ছিল দম নিতে।

শরীরের চেয়েও তার মনের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল বেশী। ছেলেটা পালিয়ে গিয়ে হয়তো ভালই করেছে। কলকাতার অদূরদর্শী জনসাধারণ হয়তো চড়চাপড় না দিয়ে ছাড়ত না। হয়তো মেয়েটাকেও হেনস্থা করত। তবু ছেলেটা রিস্ক নিয়েছিল।

মেয়েটা! চতুর মেয়েটা তা হতে দেয়নি। উজ্জ্বল যুবকদের স্কুটারে যাওয়ার এইসব মেয়েদের দূর থেকেই আবছা চেনে জোজো। এদের সঙ্গে দৈনন্দিন

জীবনে তার কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু এ মেয়েরা কেমন তার একটু আন্দাজ হয়ে গেল জোজোর।

নানা জন নানা প্রশ্ন করছে।

খুব লেগেছে দাদা ?

চোটটা ঠিক কোথায় বলুন তো !

মনে হচ্ছে কোমরের হাড় ভেঙেছে।

স্পাইনালটা ড্যামেজ হয়নি তো !

জোজো হাঁফধরা গলায় বল, না, তত‌টা কিছু নয়। সামলে যাবো।

সামলে গেলও জোজো। মিনিট দশেক বসে থেকে নিজের হাতেই ডান দিকের মাজাটা একটু ডলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াতে পারল। ভিড়টা কেটে গেল আস্তে আস্তে। কলকাতার রাস্তায় এরকম কত হতে পারে। দোষটা তারই। বড় অন্যমনস্ক ছিল।

হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। ডান পা-টা ফেলাই যাচ্ছে না। কোমর অবধি চমকে উঠছে ব্যথার বিদ্যুৎ। কিন্তু সহনীয়। আর হাঁটতেও তো তাকে হবেই। হেলমেটটা এখনো সে ধরে আছে। কী করবে এটা নিয়ে সে ? পরে ভেবে দেখা যাবে।

একটু এগিয়ে গিয়ে একটা রিক্সার জন্য দাঁড়াল জোজো। কিছুতেই আর হাঁটা যাচ্ছে না।

দাঁড়াতেই একটা স্কুটার উল্টোদিক থেকে বিপজ্জনকভাবে পাক খেয়ে চলন্ত গাড়িঘোড়ার প্রায় নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে এসে তার সামনে দাঁড়াল।

স্কুটার দেখে জোজো সভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল এক পা।

হেলমেটহীন উজ্জ্বল যুবকটি স্কুটার থেকে নেমে এল। কী ভদ্র মুখ ! কী বিনয়ী অপরাধবোধ তার চোখে !

ভাঙা বাংলায় বলল, হেলমেটটার জন্য নয়, আমি ফিরে এসেছি আপনার জন্যই। আই অ্যাম সো সরি। আপনার চোট কি খুব বেশী ?

জোজো একথার জবাব না দিয়ে ছেলেটির চোখের দিকে চেয়ে বলল, মেয়েটা কোথায় ?

ওকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি ওই মোড়ে। বাস-এ বাড়ি চলে যাবে।

আপনার বান্ধবী ?

ওয়ান অফ দি লট।

বলে আবার একটু অপরোধবোধ মেশানো হাসি হাসল ছেলেটি। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি জিমি প্যাটেল।

জোজো হ্যান্ডশেকের জন্য ততটা নয় যতটা শরীরের ভরটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যই হাতটা ধরে ফেলে বিদ্যুৎচমকের মতো আর একটা যন্ত্রণার ঢেউকে দাঁতে দাঁত চেপে হজম করে ফিসফিসে গলায় বলল, আমি জোজো।

ছেলেটা তার সবল দুহাতে জড়িয়ে ধরল জোজোকে। জোজোর স্খলিত হাত থেকে হেলমেটটা সশব্দে খসে পড়ল ফুটপাথের শানে।

ছেলেটা অতিশয় উদ্বেগের গলায় বলল, ইউ আর বিয়েলি হার্ট ! হসপিটালে নিয়ে যাবো ?

না। ততটা কিছু নয়।

ট্যাকসি ডাকব ! নাকি পিছনে উঠে বসতে পারবেন ?

কিছু লাগবে না। আমার বাড়ি বেশি দূরে নয়। একটা রিকশা...

আই অ্যাম টেরিব্‌লি সরি। বারো বছর বয়স থেকে স্কুটার চালাই। বোম্বে, দিল্লি, ক্যালকাটা। নো অ্যাকসিডেন্ট। আই অ্যাম এ সাউন্ড স্কুটারিস্ট। কিন্তু আজ আমার কপালটাই খারাপ ছিল। ইউ আর মাই ফার্স্ট ভিকটিম।

দোষ আমারই। আমি আনমাইন্ডফুল ছিলাম। কিন্তু আপনার ঘুরে আসার দরকার ছিল না। মেয়েটি ঠিকই বলেছিল, কলকাতার ক্রাউড ভাল নয়। অবশ্য যদি হেলমেটটার জন্য হয়...

ছেলেটা হেলমেটটাকে বাঁ হাতে তুলে জোজোর মুখের সামনে ধরে অত্যন্ত আহত গলায় বলল, সি, ইটস্ এ প্লাস্টিক হেলমেট। পঁচিশ-ত্রিশ টাকায় পাওয়া যায়। ফাইবার গ্লাসের হেলমেট খুব ক্লাম্‌জি বলে আমি পরতে পারি না। পুলিসকে বোকা বানাতে প্লাস্টিকের পরি। আমি হেলমেটের জন্য ঘুরে আসিনি মিস্টার।

জোজো একটু হাসল, থ্যাংক ইউ। মানুষের একটা ভাল আচরণ দেখলে আমি বড় খুশি হই। যদি সত্যিই সেটা ভাল হয়।

আপনি আমার স্কুটারে উঠুন। আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

জোজো উঠল। তারপর বলল, ওই মেয়েটার সঙ্গে আপনি মিশবেন না। ও আপনার গুণগুলো নষ্ট করে দেবে। শী ইজ এ ব্যাড গার্ল।

জিমি স্কুটারে স্টার্ট দেওয়ার আগে একটু থমকে জোজোর দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, নট দ্যাট ব্যাড। শী ওয়াজ স্কেয়ার্ড অ্যান্ড দ্যাটস অল।

মেয়েটা বাঙালী ?

হ্যাঁ।

আর আপনি ?

জিমি হাসল, হাউ টু সে। ওরিজিনালি গুজরাটি। নাউ ইন্ডিয়ান।

ইউ আর এ ভেরি হ্যান্ডসাম ম্যান।

জিমি একটু হাসল। বলল, বিয়িং হ্যান্ডসাম ইজ ট্রাবল।

কেন ?

বহুৎ ট্রাবল। সামটাইমস্ ইটস্ অলমোস্ট এ হেডেক।

তাই নাকি ? আমি হ্যান্ডসাম নই, তাই অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আমি বলছিলাম, আপনি হ্যান্ডসাম, অনেক মেয়ে-বন্ধু পাবেন। ওই মেয়েটিকে লাই দেবেন না।

জিমি এবার বেশ অবাক হয়ে তাকাল জোজোর দিকে। তারপর মৃদু হেসে বলল, শী হ্যাজ অলরেডি বিকাম ইওর অবসেশন। আপনার ব্যথাটা কেমন ?

খুব কিছু নয়। ঠিক আছে।

একবার যাবেন মেয়েটার বাসায় ? খুব দূরে নয়। ইটস্ এ নাইস ফ্যামিলি। ও আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে।

না, থাক।

শী ওয়াজ অলমোস্ট ইন টিয়ার্স। বার বার বলছিল, ছেলেটার কী হল বল তো, মরে যাবে না তো !

এ তো প্রায় মানুষের মতো কথাবার্তা !

রসিকতাটা জিমি বুঝল না, সে ততটা ভাল বাংলা জানে না। তবে খুব আগ্রহের সঙ্গে ফের বলল, যাবেন ?

আর একদিন। আজ নয়। আমি এখন একটু রেস্ট নিতে চাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই ভাল। সেটাই দরকার।

জিমি এরপর তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। ঘরে দোতলায় তুলল। বসে গল্প করল, চা খেল। ঠিক এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে বাড়ির প্রত্যেকটা লোককে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে, ভিজিয়ে, হাত করে চলে গেল।

এ বাড়িতে জোজোর নিজস্ব কোনও ঘর নেই। রাত্রিবেলা বাইরের ঘরে সোফা-কাম-বেডের ওপর একটা শতরঞ্চি আর চাদর পেতে সে শোয়। রাত্রিবেলা সে ঘরখানা একা ভোগ করে।

ছোটবোন কেয়া তার কোমরে ব্যথার ওষুধ মালিশ করে দিচ্ছিল। জোজো ব্যথার কাতর শব্দ করতে করতে বলল, কেমন দেখলি ?

কী দেখলাম ?

ছেলেটিকে ! ঘ্যাম না !

যাঃ।

পছন্দ ?

দূর !

বেশী ফুটানি মারিস না। চোখের তো পলক পড়ছিল না।

তাই নাকি ! তাহলে বউদিকে তো লক্ষ্য করিসনি।

বউদি !

মাইরি। গিলে খাচ্ছিল।

মনু কী বলেছে জানিস ?

মনু ! সে আবার কে ?

আরে হেঁজিপেঁজি মনু নয়, দি গ্রেট সংহিতাকার মনু।

কী বলেছে ?

বলেছে, মেয়েরা পুরুষদের যাকে পায় তাকে খায়, তাদের কোনও বাছবিচার নীতিবোধ নেই। এ রটন রেস।

রেখে দে তোর মনু।

তা মনু ভুলটা কী বলেছে ? বউদিই যখন জিমিকে গিলে খাচ্ছিল বলছিস তখন তো মনুর কেসটা স্ট্রংই হয়ে যাচ্ছে।

তুই কিন্তু ভীষণ উম্যানহেটার হয়ে যাচ্ছিস।

বাঃ, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা !

মোটেই নয়। একটু ভেবে দেখিস।

কী ভেবে দেখব ?

সব মেয়েই সোহাগের মত নয়। সোহাগ তোকে ডিচ করার পর থেকেই তুই অন্যরকম হয়ে গেছিস।

সোহাগ রিপ্রেজেন্টস্ মডার্ন উইমেন।

মোটেই নয়। সোহাগ ছাড়া তুই আর কটা মেয়েই বা দেখেছিস ? সোহাগ যা করেছে সেটাকে কিছুতেই জেনারালাইজ করা যায় না।

জোজো মিটিমিটি হাসছিল। বলল, আজও একজনকে দেখলাম। সেলফিস, রটন, ডেপথ্লেস।

সে আবার কে ?

জিমির সঙ্গে স্কুটারে যাচ্ছিল। ওর বান্ধবী। ছেলেটা যখন আমাকে হেল্প করতে আসছে তখন মেয়েটাই ওকে চেঁচিয়ে বারণ করল। পাবলিক হেকেল করবে সেই ভয়ে।

আহা, পুরুষেরা বুঝি ওরকম করে না ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোজো বলল, তুই তো উইমেন লিবারেটর, তুই

পুরুষের দুঃখ বুঝবি না।

বুঝে আর কাজও নেই। তুই দুঃখ বুকে নিয়ে শুয়ে থাক তো এখন। আচ্ছা, তুই না আজ অংশুদার ডেডবডি নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলি ?

শেষ অবধি যাইনি। মাঝপথে লরি থেকে নেমে পড়েছিলাম।

তা হোক, ডেডবডি ছুঁয়েছিস তো !

হ্যাঁ, কেন ?

চান করিসনি যে ! এ মাঃ ! মা যদি টের পায় তাহলে দেবেখন।

জোজো মুখটা একটু বিকৃত করে বলল, মনেই ছিল না স্নানফানের কথা। আজ আমার মনটা এত বিগড়ে গিয়েছিল। অংশুদার এরকমভাবে মরে যাওয়ার কোনও মানে হয় ? হোল লাইফ একটা ফালতু পার্টির জন্য বেগার খেটে খেটে অকালে ফিনিশ হয়ে গেল। বোগাস।

কেয়া কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, কী বলছিস রে ছোড়দা ? পার্টি-পার্টি করে তুইও তো ক'দিন আগে পাগল হতিস ?

জোজো মাথা নেড়ে, নাউ দি স্কেল হ্যাজ ফলন্ ফ্রম মাই আইজ। কী হল জানিস ? অংশুদার ডেডবডি নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন লোকটার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার একটা রিয়ালাইজেশন হচ্ছিল। এত খারাপ লাগছিল যে সুহৃদকে অনেক স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিলাম। পার্টির সঙ্গেও আর কোনও সম্পর্ক রাখব না ভাবছি। বোগাস, সব বোগাস।

কেয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পার্টির সঙ্গে তোর সম্পর্কই বা এমন কী ছিল ? আসলে তো সোহাগের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর তুই রাগ করে পার্টি নিয়ে মেতেছিলি।

কথাটা যে নির্ভুল তা জোজো খুব ভাল করে জানে। তাই জবাব দিল না।

কেয়া বলল, ভালই করেছিস। আজকাল পার্টি করার অনেক বিপদ। বাবা মা কেউ তোর পার্টি করা ভাল চোখে দেখে না।

জোজো একটু বিরক্ত হয়ে বলে, বিপদ সব কিছুতেই আছে। যা কিছু করতে যাস তাতেই বিপদ। ওটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

কেয়া একটু চুপ করে রইল। তারপর খুব নিচু গলায় বলল, তার চেয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা কর। মা-বাবাকে বেশিদিন বউদির সংসারে রাখা যাবে না। জানিস তো। সেপারেট না হয়ে আমাদের উপায় নেই।

জোজো ক্লান্ত মাথাটা যতদূর সম্ভব বালিশে ডুবিয়ে দিল। তারপর বলল, আমি যে কী করব তা ভেবেই পাই না ! নো ব্রেক থ্রু, নো গেট অ্যাওয়ে।

কেয়া মালিশ শেষ করে শিশির মুখ বন্ধ করল। উঠে বাতি নিবিয়ে দিল।

বলল, ঘুমো। আজ তুই খুব টায়ার্ড।

জোজো অবশ্য ঘুমোলো না। অংশুদার করুণ মৃত্যু, তার নিজের দুর্ঘটনা, কোমরের ব্যথা, জিমি প্যাটেল আর সেই মেয়েটা সব মিলিয়ে তার মাথাটা আজ ভারী গুবলেট। নতুন করে আর একটা ব্যথাও শুরু হল। সোহাগ। সোহাগ মানেই গোপন এক রক্তক্ষরণ। এক প্রতিকারহীন পরাজয়। আচমকা সাপ দেখলে যেমন মানুষ চমকে ওঠে, সোহাগের স্মৃতিও ঠিক তেমনি হঠাৎ এসে চমকে দিয়ে যায়।

অংশুদার সঙ্গে তার দহরম-মহরমের পিছনেও ছিল একটি মেয়ে। সোহাগ। আজকাল মেয়েদের যে কত রকমের নতুন নতুন নামকরণ হচ্ছে! নামটাই ভিজিয়ে দিয়েছিল জোজোকে। সুহৃদের এই মাসতুতো বোনটি যশোরের মেয়ে। একাত্তরে হাঙ্গামায় ফ্রকপরা মেয়েটি মা-বাবার সঙ্গে চলে আসে কলকাতায়। সুহৃদদের বাড়িতে তখন থেকে দেখা। জোজো তাকে মাঝে মাঝে পড়িয়েছে। মা আর মেয়ে এখানেই রয়ে গেল। তার বাবা ফিরে গেল স্বাধীন বাংলাদেশে। সোহাগ পাশ করে কলেজে ভর্তি হল। বি এ পাশ করল বাংলায় অনার্স নিয়ে। আর ততদিনে জোজোর সঙ্গে তার একটা অস্পষ্ট সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। প্রেমই হবে। বেশ সহজ একটা শ্রী ছিল সোহাগের। সামান্য পুরু ঠোঁট, ভরা মুখ, টানা না হলেও প্রাণশক্তিতে ভরা ঝকঝকে দুটি চোখ। দারুণ স্বাস্থ্য।

মুশকিল হল, বাংলাদেশে সোহাগের বাপকে নিয়ে। লোকটা স্ত্রী-কন্যার বিরহে এবং বোধহয় খানিকটা হতাশায় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ায় আদায়-উসুল করতে পারছিল না। টাকাও তাই অনিয়মিত হয়ে পড়ল। সুহৃদদের সংসারের অবস্থাও মোটেই ভাল ছিল না। দু-দুটি প্রাণীর বাড়তি খরচ বহুকাল চালিয়ে তারা বেশ নাজেহাল। সোহাগের তখন চাকরি একটা না পেলেই নয়।

সোহাগের চাকরির জন্য জোজো কম ছোটাছুটি দৌড়োদৌড়ি ধরাধরি করেনি। অবশেষে কর্ড লাইনের বেগমপুরে একটা মেয়েস্কুলে চাকরি পেয়ে গেল সোহাগ। প্রথমে লিভ ভ্যাকান্সিতে। পরে আস্তে আস্তে পাকা জায়গা করে নিল।

ছুটির দিনে বেগমপুরে জোজোর ছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। সেখানে মা আর মেয়ের সংসার ছিল ছোট্ট একখানা ঘরে। সামান্য আসবাবপত্র, সামান্য তৈজস, কিন্তু ভারী শান্তি আর শ্রী ছিল তাদের ঘরে। সকালবেলায় গিয়ে হাজির হত জোজো। ওমলেট, মুড়ি, চা দিয়ে শুরু হত দিন। দুপুরে বেশ একটু গুরুতর রান্নাবান্না হত। বড় মাছ, ক্বচিৎ মাংস, ধোঁকার ডালনা, ইত্যাদি। নিজেদের বাসায় জোজোর এরকম খাবার জুটত না। বলতে নেই, অমন যত্নআত্তি এবং খাতিরও

নয়। সোহাগের মা তাকে মোটামুটি জামাই হিসেবে স্থির করেই রেখেছিল। আর জোজোও নিজের অধিকার সম্পর্কে ছিল নিশ্চিন্ত।

আশ্চর্য এই, বেশ কয়েক বছরের ঘনিষ্ঠতা এবং ভবিষ্যৎ স্ত্রী হিসেবে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও সে কখনও সোহাগকে চুমু খায়নি, আশ্লেষে কখনও আলিঙ্গন করেনি বা ওইরকমতর আর কিছু। এক কথা, তার স্বভাব-সংকোচ এবং রুচিশীলতা। তার বাবা কালীকিংকর ছেলেবেলা থেকেই ছেলেদের নীতিশিক্ষা দিয়েছিলেন। মেয়েদের সম্পর্কে স্বভাবজ এক শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সম্মানজনক দূরত্ব রাখা যে কতটা প্রয়োজন তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সোহাগ তো তারই। একদিন সোহাগের সবটুকুই সে তো পাবেই। কাজ কী ওকে পুরোনো করে দেওয়ার ? চোখে চোখে যখন চাইত দুজনে তখন বিদ্যুৎ খেলত না, হয়তো রোমাঞ্চ হত না, কিন্তু এক পরম নির্ভর ও বিশ্বস্ততায় ভরে উঠত জোজো। এই একটা আশ্রয় তার, এক শান্তির জায়গা।

আর পাঁচটা রবিবারের মতো সেই রবিবারটা ছিল না। দেখতে একইরকম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই রবিবারটা ছিল অন্যরকম। কলকাতায় শরৎকাল কেমন তা বোঝা যায় না, কিন্তু বেগমপুরে বোঝা যায়। আলোয় মেশানো সোনার গুঁড়ো, আকাশের গায়ে নতুন করে কলি ফেরানো, ফর্সা মেঘ আর শিউলির শিহরিত গন্ধ। সেই রবিবারটা ছিল অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরা। সেই সুন্দর রবিবারে সোহাগদের ঘরের সামনেকার ছোট্ট বারান্দায় একটি মোড়ার ওপর এক অতি সুন্দর পুরুষ বসে ছিল। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, চওড়া পাড়ের তাঁতের ধুতি। রংটা তার এত ফর্সা যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঈষৎ পিঙ্গল চোখ, লালচে চুল। ঠোঁট দুখানা টুকটুক করছে লাল, হাতপায়ের চেটোয় এবং তেলোয় শিশুর মতো বক্তিমাভা। যেমন ঢলঢলে মুখখানা, তেমনি সরল ও মদির চাউনি তার দুখানা টানা টানা চোখে। এতই সুন্দর যে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তার হাবভাব ও কথাবার্তায় এক অতি শিষ্ট বিনয়।

সোহাগ নয়, তার মা তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল, এ ছেলেটি হল এখানকার গাঙ্গুলি বাড়ির ছেলে রঞ্জন। মোহন গাঙ্গুলির নাম শুনেছো তো ! ওদেরই তো সব এখানকার। স্কুল, বাজার, নার্সিং হোম, হিমঘর। বিলেত থেকে ফিরেছে এই মাসটাক, খুব খোঁজখবর নেয় আমাদের। ওদের আশ্রয়েই তো আছি। আলাপ করো বাবা।

খুব বেশীক্ষণ নয়, জোজো পৌঁছোনোর পর রঞ্জন গাঙ্গুলি বোধহয় আর মিনিট দশেক বসে ছিল। বিলেতে টেকনোলজি শিখতে গিয়েছিল। মস্ত চাকরি পেয়েছে কলকাতায়। সেইসব কথা হল। নিজের তেমন কোনও পরিচয় তার

দেওয়ার ছিল না রঞ্জন গাঙ্গুলিকে। ভাবী লজ্জাব কথা।

কে জানে কেন, বহুকাল এত হীনমন্য বোধ কর্বেনি জোজো, যতটা সেদিন ওই অতি সুপুরুষ, সফল ও ভাগ্যবান যুবকটির সামনে করেছিল। যেন একটা আলো নিবে গেল তার ভিতরে। সবচেয়ে সন্দেহজনক ছিল একটি ব্যাপার। যতক্ষণ রঞ্জন ছিল, ততক্ষণ একবারের জন্যও সোহাগ সামনে আসেনি। এমনকি তার কণ্ঠস্বব পর্যন্ত শোনা যায়নি বারান্দা থেকে।

প্রতি রবিবারেব মতোই এবপরে এলো ডিমভাজা আব মুড়ি, দুপুরে দেদার ভাল খাবার। বিকেলে আলুভাজা দিয়ে ফুরফুরে চিঁড়ে ভাজা, চা। কিন্তু সারা দিনটা কাটল কেমন যেন আড়ভাবে। কোথায় যেন একটু তালভঙ্গ ঘটছিল বারবার। সোহাগেব চোখে চোখ বড একটা হল না সেদিন।

ফেরার সময় কেন যে সেদিন সন্ধ্যার আঁধারে পথে বারবার হোঁচট খাচ্ছিল জোজো। চেনা রাস্তা। কতবাব এসেছে। তবু বারবার হোঁচট খেতে খেতে স্টেশনে পৌঁছল সে। একটা গাড়ি অল্পের জন্য ধরতে পারল না, যেটা প্রতি রবিবারই ধরতে পারে সে। তারপর ট্রেনের ফাঁকা কামরায় উঠে কলকাতা অবধি সে চুপচাপ বসে রইল যেন এক শূন্য বলয়ের মধ্যে। বাইবের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন। আর তার সামনের ফাঁকা বেঞ্চে সে সারাক্ষণ মনশ্চক্ষে বসে থাকতে দেখল ওই দেবদূতেব মতো সুপুরুষ রঞ্জন গাঙ্গুলিকে।

ঘটনা কোন্‌দিকে ঘুরে যাচ্ছে তার বোধহয় একটা সংকেত পেয়েছিল জোজো। কিন্তু ধবতে পারেনি।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সোহাগেব চিঠিটা এল। দীর্ঘ চিঠি। তাতে যে কত মনস্তাপ, কান্নাকাটি, ক্ষমাপ্রার্থনা ছিল তার হিসেব নেই। হ্যাঁ, বঞ্জনের সঙ্গে তার রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। বিয়ে পুজোর পর, আনুষ্ঠানিকভাবে। এছাড়া নাকি সোহাগের উপায় ছিল না। মা এত ভাল পাত্র হাতছাড়া করতে নারাজ। তাছাড়া বেগমপুবে থাকতে গেলে··· ইত্যাদি। সেই নরম, অনুশোচনায় ভরা, দীন চিঠির ভিতর থেকে কতবার যে বজ্রাঘাত হল জোজোর বুকে তারও হিসেব নেই। মাথাটা পাগল-পাগল হয়ে গেল, সারা শরীর ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল অপমানে।

কিন্তু প্রথম উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর এক গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন জোজো নিজের দিকে চোখ ফেরাল। সে কী? সে কে?

সামান্য একজন মধ্যবিত্তের ছেলে। লেখাপড়ায় তত ভাল নয়। চাকরি নামকোবাস্তে একটা আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে সংসার করার কথা ভাবাও যায় না। আভিজাত্য নেই, বিত্ত নেই, মর্যাদা নেই, পায়ের নিচে নেই কোনও শক্ত ভিত। সোহাগ যে তাকে এত বছর প্রশ্রয় দিয়েছিল এই তো ঢের।

প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নয়, সোহাগকে হারানোর দুঃখেও নয়, শুধু নিজের ওপর রাগ আর ঘেন্নায় জোজো পাগল হয়ে গিয়েছিল। দিনতিনেক উদ্‌ভ্রান্ত এক ঘোরের মধ্যে থেকে সে সহজলভ্য ইঁদুরের বিষ কিনে আনল।

এ জীবন রাখার কোনো মানেই হয় না এই কথা ধ্রুব জেনে সে গভীর রাতে উঠে গেল ছাদে। মাদুর পেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছায়ামূর্তির মতো তার পাশে এসে বসলেন কালীকিংকর। কাঁপা হাতে তার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, আমাকেও তাহলে একটু দে।

বাবা! তুমি এখানে কেন?

তোকে তিনদিন ধরে নজরে নজরে রাখছি। জানি কী একটা ঘটাবি। কেন এই বুড়োবয়সে আমাকে দাগা দিবি বাপ? একটা মেয়ের জন্য? সে কি এত বড় হল?

সোহাগের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এবং পরবর্তী ঘটনা একমাত্র জানত কেয়া। সে-ই হয়তো বলেছিল বাবাকে। অধোবদন জোজো বাবাকে বলল, তুমি ঘরে যাও।

যাবো। তোকে নিয়েই যাবো। নইলে আয় বাপ-ব্যাটায় একসঙ্গে মরি।

জোজো অঝোরে কেঁদেছিল এরপর।

কালীকিংকর মৃদুস্বরে বললেন, ভালবাসা মানে কী জানিস? যাকে ভালবাসা যায় তার ভালতে বাস করা। তার যদি ভাল হয় তো তোর সুখ হবে। আমি তো ভেবে দেখলাম, সোহাগের ভালই হল। তাকে তুই বিয়ে করলে কোথায় এনে রাখতি, কী খাওয়াতি, কী গতি হত ছেলেপুলেগুলোর? তার চেয়ে এই বেশ হয়েছে। তুই খুশি হ। তার ভাল হয়েছে ভেবে মনটাকে বেঁধে ফেল। দখল চলে গেল বলে দুঃখ করিস না।

জোজোর মরা হয়নি। কিন্তু মেয়েদের ওপর সেই যে মনটা তার বেঁকে বসল সেই বাঁকা আজও সোজা হয়নি।

জোজো মাঝে মাঝে ভাবে, সে কি একটু পুরোনো আমলের মানসিকতাসম্পন্ন? সে যেরকমভাবে সোহাগের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করেছিল, যে আবেগ ও কল্পনা মিশে থাকত তার ওই মেয়েটিকে ঘিরে তা তো এখনকার ছেলেমেয়েদের নেই! যেরকম বেনোজলের মতো প্রেম ধেয়ে আসত সে আমলের নরনারীর মধ্যে, যেমনটা ঘটে থাকে রোমান্টিক গল্প-উপন্যাসে, তা কোথায় এখন আর? তার বয়সের যারা, তাদের মধ্যে ছেলেতে মেয়েতে মেশামেশি কত সহজ ও অনায়াস। কত আবেগবর্জিত, কত বন্ধুর মতো

সম্পর্ক। কাঁপা বুক, ঘন শ্বাস, অবনতচক্ষু, লজ্জার লালিমা দুনিয়া থেকে লোপাট হয়ে গেল বুঝি। প্রেম নামক যে অদৃশ্য নদীর বেনো জল যুবক-যুবতীদের বুকের মধ্যে ঢুকে নানা তোলপাড় কাণ্ড করত এক কালে,তাতে এখন চড়া পড়ে গেছে, শুকিয়ে যাচ্ছে নদীর খাত। মানুষের হৃদয় এখন আর তত গভীর নয়। কত বাণিজ্যিক হয়েছে মানুষ, কত বাস্তববাদী! সে কেন তবে অত খোকা ছিল? সুযোগ ছিল, তবু চুমু খায়নি কখনও, জড়িয়ে ধরেনি, কিচ্ছু করেনি। আজকাল বন্ধুর সঙ্গে বান্ধবীরাও ওসব করে অনায়াসে, বিয়ে হবে না জেনেও।

ওই যে জিমি। স্কুটারের বান্ধবী সম্পর্কে বলেছিল, ওয়ান অফ দি লট।

ভাবতে ভাবতে জোজো আপনমনেই হাসছিল। আজও তার বুকের মধ্যে টিপটিপ করে রক্তক্ষরণ হয়। চিঠি পাওয়ার পর আর কখনও বেগমপুরে যায়নি জোজো। সোহাগের সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি। কেউ কাউকে আর চিঠিও দেয়নি। সুহৃদ একবার কী যেন একটু বলতে এসেছিল আগ বাড়িয়ে। জোজো বলেছিল, প্লীজ, ও প্রসঙ্গ আর নয়।

সোহাগ হয়তো বিশ্রী রকমের মোটা হয়ে গেছে। গালে মেচেতা পড়েছে। চোখে চশমা কি? তাকে হয়তো মধ্যবয়সী দেখায়। হয়তো একগাদা ছেলেপুলে।

এসব কিছু তো সত্যি নয়। তবু ওরকমই কল্পনা করে জোজো। আর এইটুকুই তার যা কিছু প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ। এর বেশি জোজোর মতো শক্তিহীন মানুষ আর কী করতে পারে ওই অতি সুপুরুষ, অতি ধনী, অতীব গুণসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে? কী করেই বা পারে প্রিয় মহিলার হস্তান্তর রোধ করতে?

না, জোজো কিছুই পারে না। মানুষ হিসেবে সে জিরো।

ভাবতে ভাবতে জোজো ঘুমোলো।

★ ★ ★

এ বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর, দক্ষিণমুখী ঘরখানা ভোগ করে বিমল, কালীকিংকরের বড় ছেলে। এই ঘরখানাই সবচেয়ে বড়। লাগোয়া বাথরুম আছে। যদিও ভাড়ার বাড়ি তবু এই ঘরখানার দেয়ালে বেশ খরচ করে চার রকমের রঙ লাগানো হয়েছে চারটে দেয়ালে। আলোর ফিটিংস সবই প্রায় পিতলের। বাহারী পেলমেট থেকে ঝুলছে মহার্ঘ পর্দা। দু'খানা বক্স খাট জোড়া দেওয়া মস্ত বিছানায় শোয় অন্বেষা আর তার রোগা ছেলে গোপু। আর একখানা সরু বেতের খাটে আলাদা বিছানায় শোয় বিমল। ঘরে স্টিলের আলমারি,

ওয়ার্ডরোব, তিন পিস আয়নার ড্রেসিং টেবিল, বুক কেস, লেখাপড়ার টেবিল-চেয়ার এবং আর যা যা আছে সবই বেশ ঝকঝকে এবং দামী। এ বাসার অন্যান্য ঘরের প্রকট দারিদ্র্যের সঙ্গে এ ঘরের একেবারেই মিল নেই। এ ঘরে সচরাচর স্বামী-স্ত্রী ছাড়া হুট করে কেউ ঢোকে না।

নীল মশারির মধ্যে প্রকাণ্ড বিছানায় একটা ছোট্ট পোকার মতো ঘুমিয়ে আছে রোগা গোপু। বিমল তার সরু বিছানায় শুয়ে একটি সেক্স ম্যাগাজিনের নগ্ন ছবি দেখছে গোলাপী মশারির মধ্যে। একটি স্বচ্ছ লালচে নাইটি পরা অন্বেষা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মুখে ক্লিনজিং ক্রিম ঘষছে। সামনে আরও কয়েকটা রূপটানের শিশি বা কৌটো।

অন্বেষাকে সুন্দরী বলা যাবে কিনা সেটা বিচার্য বিষয়। খুঁটিয়ে দেখলে কিছু সৌন্দর্যের লক্ষণ আছে, কিছু অসৌন্দর্যের। তবে আলগা একটা চটক তার বরাবরই ছিল। ছোটো নাক, পুরু ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ। তাকে ব্রিজিত বার্দোতি বলে একসময়ে চ্যাংড়া ছেলেরা ডাকত। খাদ্যের প্রতি আসক্তি এবং বাছবিচারের অভাবের ফলে সে বেশ থলথলে মোটা হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং ডায়েটিং এবং কিছু আসনমুদ্রা করে একটু মেদ ঝরিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার শ্রী খোলেনি, চেহারায় তারুণ্যও আসেনি। বরং কিছু কাহিল, ক্লান্ত এবং বিরক্ত। অন্বেষা বা অনু যে যথেষ্ট রাগী তা তার চোখ দেখলেই বোঝা যায়। অল্পেই সে রাগে এবং চেঁচিয়ে প্রতিপক্ষের বাপান্ত করে। তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না এবং অশ্লীল নোংরা কথা বা খিস্তিখেউড় এবং গালাগাল তার স্টকে অঢেল।

বিমল তার বউকে ভয় পায়। সেই ভয় এমন একটা অবসেশন বা অভিভূতির সৃষ্টি করেছে ক্রমে ক্রমে যে, বিমল তার স্ত্রীর প্রতি আর কামাসক্ত হতে পারে না। অনেক চেষ্টা করেও না। ফলে…

অনু মুখ ফিরিয়ে বলল, হল?

হতাশায় মাথা নাড়ল বিমল, না। আমার বোধহয়…

তুমি ডাক্তারের কাছে আবার যাও।

আবার? গিয়ে কী লাভ? আমি স্পেন্ট আপ।

অনু কঠিন স্বরে বলল, স্পেন্ট আপ কিনা তা আমি জানি না। ডাক্তার বলেছিল তোমার অক্ষমতা ফিজিক্যাল নয়, সাইকোলজিক্যাল।

জানি।

তুমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও।

আমি তো মেন্টালি ডিসব্যালান্সড নই।

কে বলল নও! যে নিজের স্ত্রীর প্রতি দিনের পর দিন উদাসীন থাকতে পারে

সেও একরকম পাগল। পাগল কি আর সবসময় রাস্তায় ন্যাংটো হয়ে ঘোরে ? নাকি বিড়বিড় করে তোমার বাবার মতো !

বিমল সেক্স ম্যাগাজিনটা বালিশের পাশে রেখে চুপ করে অনুর দিকে চেয়ে রইল। সেই দৃষ্টিতে প্রেম নেই, কিন্তু মার-খাওয়া কুকুরের মতো সন্ত্রস্ত ভাব আছে।

তার স্ত্রী অনুর প্রতি একসময়ে তার উদ্দাম আসক্তি ছিল। তখন তাদের মিলন ছিল মুহুর্মুহু। তারপর অনু ক্রমে ক্রমে সংসারে তার দাঁত নখ বের করতে লাগল। তার আধিপত্য বিস্তারিত হতে লাগল সকলের ওপর। ঝগড়া, চেঁচামেচি, অশ্রাব্য গালাগালির বিনিময়ে সেই আধিপত্য এখন প্রায় নিশ্ছিদ্র। নিরঙ্কুশ।

সেই সাঙ্ঘাতিক আধিপত্য যখন বিমলকেও দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল, যখন আর পেছনে হটে যাওয়ার জায়গা ছিল না, তখনই সে উপগমনের সময় দুর্বল থেকে দুর্বলতব হয়ে যেতে লাগল। স্ত্রীর ভয়াল ব্যক্তিত্বই বোধহয় তাকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছিল। তার ওপর অনু যখন মিলনের জন্য তাড়না করত তখন নিজের অক্ষমতায় দিন দিন আরও লজ্জিত ও দুর্বল হয়ে যেতে লাগল সে।

বিচক্ষণ এক যৌন বিশারদ ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন। নিয়মিত সেক্স ম্যাগাজিন বা ট্রিপল এক্স মার্কা ভিডিও দেখার পরামর্শ তিনিই দেন। অনুর তাড়নায় গুচ্ছের সেক্স ম্যাগাজিন লজ্জার মাথা খেয়ে লাইট হাউসের গলি থেকে চড়া দামে কিনে আনতে হয়েছে বিমলকে। কিন্তু তাতে লাভ কী ? তার ভিতরে কামের তো অভাব নেই। শুধু এই একজনের সঙ্গেই সে পেরে ওঠে না।

যৌনতা যতটা শারীরিক ততটাই মানসিক। বিমল তা জানে। অনুর প্রতি তার ভয়ার্ত হীনমন্যতা যতদিন থাকবে ততদিন মানসিক উত্থান ঘটবার সম্ভাবনা নেই। কোন সাইকিয়াট্রিস্ট এর চিকিৎসা করবে ?

তুমি হরমোন ইনজেকশন নাও।

হরমোন ?

বা ওইরকম যা সব ওষুধ আছে। আজকাল অনেক ট্যাবলেটও বেরিয়েছে শুনেছি।

দেখবখন !

আর এটা কবতে বেশী দেরী কোরো না।

আচ্ছা।

আজ রাতে পারবে না তো ! আজ আমার কিছু উত্তেজনা আছে।

আজ ! বলে বিমল কাহিল মুখে চেয়ে রইল।

ঠিক আছে। আজ ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, এটা দিনের পর দিন চলতে পারে না।

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু বলার নেই। আজ অনু তবু সিন ক্রিয়েট করল না। কিন্তু অন্যান্য দিন করে। এবং তার চিৎকার ক্ষোভ ও হতাশার কথা নিস্তব্ধ রাতে বহুদূর পর্যন্ত আকাশবাণীর মতো ছড়িয়ে যায়। বাড়ির লোক জানে, নিকটবর্তী পাড়া প্রতিবেশীরাও জানে, বিমল তার স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় অক্ষম।

আজ কেন চেঁচাল না কে জানে!

ছেলেবেলা থেকে বিমলের ইচ্ছে ছিল কোনও মহৎ কাজে প্রাণ বিসর্জন দেবে। দেশের কাজে বা কারও প্রাণ বাঁচাতে বা যুদ্ধে গিয়ে বা বৈমানিক হয়ে। আজকাল তার অতিশয় হাস্যকর এক কারণে প্রাণ বিসর্জন দিতে ইচ্ছে করে। তা হল স্ত্রীর প্রতি যৌন অক্ষমতা।

অনু মুখে একটা মাস্ক তৈরি করে অত্যন্ত চাপা গড়গড়ে গলায় বলল, বেশিদিন উপোসী থাকলে কী হতে পারে জানো ? তখন আর বউ সতীলক্ষ্মী থাকে না। কাজেই এইবেলা মুরোদ বাড়াও। নইলে আই শ্যাল হ্যাভ মাই ওন ওয়ে।

প্লীজ অনু !

ন্যাকামি কোরো না। আমার ওপর তোমার অ্যাট্রাকশন নেই কেন তা জানি না নাকি ? ইউ আর সেকসুয়ালি ইনভল্‌ভড্‌ উইথ ইওর...

দু'হাতে কান ঢাকা দিতে দিতে আর্তস্বরে বিমল বলল, প্লীজ অনু... প্লীজ ..

ইওর সিস্টার। নইলে...

কথাটা নতুন নয়। বহুবার বলেছে অনু। কতবার বিদ্যুতের মতো কিছু স্পর্শ করেছে তাকে। সে ছটফট করেছে যন্ত্রণায়। এখন ভোঁতা হয়ে গেছে অনেক। অনুর আক্রমণ এরকমই নির্লজ্জ, পাগলাটে, বর্বর।

বিমল কী করবে ? তার কিছু করার নেই।

আজকাল অঢেল ট্র্যাংকুইলাইজার থাকে তার কাছে। দুটো বড়ি সে একসঙ্গে খেয়ে নিল।

অনু তার মাস্ক মেখে বিছানায় ঢুকল। বেডসুইচ টিপে বড় আলো নিবিয়ে দিল। ঘরটা ভরে রইল সবুজ ড্রিম ল্যাম্পের আলোয়।

বিমল খুব আস্তে করে তার নিশ্চিন্দির শ্বাসটা ছাড়ল এবার।

আরও একটা বিপজ্জনক রাতের ফাঁড়া কাটল। কিন্তু কতদিন ? কতদিন সে সাপের সঙ্গে বদ্ধ ঘরে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকবে !

ও কি অন্য পুরুষেব সঙ্গে শোবে ? সত্যিই শোবে ? বিমলের শরীবটা শক্ত হয়ে গেল পলকের জন্য। তারপব শিথিল হল ফেব।

শোবে ? শুক না। এ দুনিয়ায কেউ তো কারও কেনা নয়। বরং শুলে বেঁচে যাবে বিমল। রাতের পব রাত গ্লানি আব পরাজয়ে ডুবে থাকতে হবে না।

শোবে ? শুক না। কাল ঘুম থেকে উঠেই বিমল ওকে মুচলেকা দিযে দেবে। দবকার হলে ক্লায়েন্টও এনে দেবে। তবু তার মুক্তি দরকাব।

বিমল পাশ ফিবল সন্তর্পণে। অনুব দিকে পেছন ফিবে শুযে নিশ্চিন্ত ঘুমের কোলে ঢলে পডাব আগে সে নিজেব তীব্র কাম অনুভব করে নিল। না, তাব পুরুষত্ব একটুও চলে যায় নি।

অনুব ঘুম আসবে কি আজ ? আসে কখনও, শবীরেব এই জোযাব নিয়ে তাব শ্বাস গাঢ়, উত্তপ্ত ! তাব শরীবেব রোমকূপে শিহবন। বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে বন্ধ্রে রন্ধ্রে।

বিমল ! না, বিমলেব অক্ষমতা আব তাকে স্পর্শ করছে না আজ। বেচাবাকে ক্ষমা কবা যায়।

আজ তাকে বেহেড করে গেছে জিমি প্যাটেল। কী সটান সতেজ দুই উরু, কী গভীব নাভিদেশ, কী বিশাল বুক ! দুই সবল হাত যখন কাউকে জডিয়ে ধববে পাঁজর ভেঙে ফেলবে আশ্লেষে। আব মুখ ! অমন সেক্সি মুখ অনু আজ অবধি কোনও পুরুষের দেখেনি।

জিমিকে আবাব আসতে বলেছে অনু। অফিসেব ঠিকানা দিয়েছে।

আসবে কি ?

ওর ঠিকানা আর ফোন নাম্বার আছে তার কাছে। যদি না আসে তবে অন্বেষাই ডাকবে তাকে। একটা অজুহাত চাই, এই তো ! কত কী আছে।

একটি অত্যন্ত অবৈধ মিলনদৃশ্য কল্পনা কবল অন্বেষা। এত জোবালো সে কল্পনা যে, তাব শরীরেও প্রতিক্রিয়া হতে লাগল।

পাগলেব মতো ছটফট করল কিছুক্ষণ।

তাবপর উঠে সেও খেল দুটো ট্র্যাংকুইলাইজাব।

সে যথেষ্ট ভাল চাকবি করে। তাব যৌবন এখনও বহুদিন বাকি। সে এখনও বেশ সুন্দবী। তাব নপুংসক স্বামী তার কোনও কাজেই বাধা দিতে সক্ষম নয়। তাহলে অন্বেষাব আব বাধা কী ?

বালিশের মধ্যে তাব উষ্ণ শ্বাসবায়ু যে কতবাব "জিমি জিমি" করে কেঁপে কেঁপে মিশে গেল তাব হিসেব নেই। তাবপব এল এক ঝিমধবা তন্দ্রা

ঝম্পটি বাবুর অস্ত্রশস্ত্র

ঝম্পটিবাবু গত কয়েকদিন ধরেই নানা ধরনের অস্ত্রের কথা ভাবছেন। পিস্তল বন্দুক তাঁর আওতার বাইরে। কিন্তু সহজলভ্য কিছু অস্ত্রও তো আছে। যেমন থ্রোয়িং নাইফ, তীর-ধনুক, চপার। না, চপার নয়। কাছ থেকে প্রয়োগ করতে হয় এমন অস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি চান দূর থেকে, আড়াল থেকে প্রয়োগযোগ্য অস্ত্র।

অনেক ভেবেচিন্তে থ্রোয়িং নাইফটা তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। প্রথমত জিনিসটা বোধহয় এদেশে ভাল তৈরি হয় না। দ্বিতীয়ত ওসব আবার ছুঁড়তে শিখতেও হয়।

একমাত্র তীর-ধনুকটাই সুবিধাজনক। লুকিয়ে গিয়ে ছোড়া যায় না বটে, কিন্তু কাজের জিনিস। তিনি ছেলেবেলায় বিস্তর তীর ছুঁড়েছেন। অভ্যাসটা একটু ঝালিয়ে নিলেই হল।

ছেলেবেলায় এক স্বাধীনচিত্ত সাঁওতাল যুবাপুরুষকে দেখতেন, কাঠের মোথা লাগানো তীর দিয়ে নির্ভুল নিশানা পাখি মারতে। অদ্ভুত তীরটাও, মাথায় ফলা নেই, শুধু কাঠের একটা ছিপির মতো জিনিস আটকানো। সেই যুবক বুঝিয়েছিল, তীরের ফলায় পাখির রক্তক্ষরণ হয়। তাতে মাংসের স্বাদ মরে যায়।

হঠাৎ দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ লকলকে সেই যুবা অর্জুনের মতো তীর-ধনুক নিয়ে জাম গাছের ডালে তাক করছে।

ব্লো পাইপ বলেও একটা জিনিস আছে না? ছেলেবেলায় ডিটেকটিভ বইতে পড়েছিলেন; চোঙের মতো, ভিতরে বিষ মাখানো ছুঁচ ভরা থাকে। জোরে ফুঁ দিলে ছুঁচ সুড়ুক করে গিয়ে বেঁধে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অক্কা।

কিন্তু পাওয়া যাবে কি ওরকম জিনিস? বোধহয় না।

তীর-ধনুকই ভাল। ঝম্পটিবাবু যদি বারান্দার ডান কোনটায় দাঁড়ান তাহলে সামনে গলিটায় যেখানে স্কুটারটা এসে থামে সেটা বেশি দূরও হয় না। বেশ আড়ালও হয়। ধনুকটা জোরালো হলে এখান থেকে চমৎকার গেঁথে ফেলা যাবে।

ঝম্পটিবাবু অন্ধকারে একটু ঝুঁকে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রইলেন। আজ বিকেলেও ছোকরা এসেছিল। কী বিশাল থামের মতো ঊরু, প্যান্ট যেন ফেটে পড়ছে। বুকখানাও চ্যাটালো বিশাল। আর কী দুখানা হাত রে বাবা, যেন

পিস্টন।

এসব ছোকরাই মধুবন্তীর পছন্দ। হ্যাঁ, এইসব ছোকরাই। স্কুটার থেকে নেমে ছোকরা এ-বাড়িতে ঢোকে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে আসে মধুবন্তীর ঘরে। সবই জানেন ঝম্পটিবাবু।

আপাতত তীর-ধনুকটা জোগাড় রাখা দরকার। কিন্তু...

কে, ঝম্পটিদা নাকি? পাশের ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে প্রশ্নটা আসে অন্ধকারে।

কে, বিজয়?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কী দেখছেন?

তুমি কখনও সাঁওতাল পরগণায় গেছ বিজয়?

দু-একবার। কেন?

ওখানে সাঁওতালরা থাকে?

নিশ্চয়ই। কেন বলুন তো!

আমার তীরধনুক দরকার। সাঁওতালরা ভাল বানায়।

বিজয় অবাক হয়ে বলল, তীরধনুক? আপনি তীরধনুক খুঁজছেন?

ঝম্পটিবাবু চাপা জরুরী গলায় বললেন, খুঁজছি। ওরা ছাড়া ভালো জিনিস আর কেউ বানাতে পারে না।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু তীরধনুক দিয়ে করবেন কী?

হাতে রাখা ভাল। গায়ের জোরে তো পেরে উঠব না। ছোঁড়াটার চেহারা তো দেখনি। থামের মতো ঊরু, ইয়া বুকের ছাতি, হাত দুখানা কী রে বাবা!

ঝম্পটিবাবুর ছোকরা-অবসেশনের কথা বিজয় ভালই জানে। ছেলে-ছোকরাদের উনি সন্দেহ করেন, ভয় পান এবং এড়িয়ে চলেন। কিন্তু নতুন এই ছোকরাটি কে তা জানার কৌতূহল হল বিজয়ের। বলল, কে বলুন তো!

বিকেলেও এসেছিল। দেখনি? স্কুটারে করে আসে। ফুটপাথের ধারে ওই বাঘপানা জিনিসটার পাশে স্কুটারটা রাখে। তারপর উঠে আসে।

বেশ সুন্দর দেখতে? ফর্সা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই ভাল চেহারা। মধু তো ওরকম চেহারাই পছন্দ করে।

মধু বা মধুবন্তী ঝম্পটিবাবুর বউ। বিজয় একটু হেসে বলল, ও ছোকরার নাম জিমি প্যাটেল। আমার বন্ধু। আমাদের বাড়িতেই আসে।

বন্ধু! বলে ঝম্পটিবাবু বড় বড় চোখ করে চাইলেন। তারপর বললেন একদম ঢুকতে দিও না বাড়িতে। একদম না। তোমার বোনগুলো যুবতী দেখতেও ভাল। সর্বনাশ হয়ে যাবে যে।

ঝম্পটিবাবু একটুখানি পাগল ঠিকই, তবে ওই একটিমাত্র ক্ষেত্রে। দুনিয়ায় সব ছেলেছোকরার নজর তার বউয়ের দিকে, এই সন্দেহ থেকেই তার ভিতরটা গোলমাল হয়ে গেছে। সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কার সঙ্গে যে সংলাপ রচনা করেন কে জানে। বিজয় শুনেছে রাইটার্সের এই পুরোনো কেরাণী কাজেকর্মে খুবই দক্ষ। লোকটিও সৎ। আর আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর বউ মধুবন্তীরও কোনও গোলমাল নেই। মধুবন্তী এমন কিছু সুন্দরী নয়, ছলাকলাও তেমন জানে না, সাজগোজের বাহার নেই। গ্রামের গরিব ঘরের মেয়ে। সারাদিন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তবু কেন, কোন রন্ধ্রপথে সন্দেহটা ঢুকল ঝম্পটিবাবুর মাথায় তা অনেকবার ভেবেও বুঝতে পারে না বিজয়। মধুবন্তী মাঝে মাঝে খুব কান্নাকাটি করে। অশান্তি হয়।

বিজয় বলল, তীরধনুক খুব বিপজ্জনক জিনিস ঝম্পটিবাবু। ওসব চিন্তা ছাড়ুন।

রাখা ভাল। সকলেরই হাতের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকা ভাল। কখন যে দরকার পড়ে যাবে কে জানে। ব্লো পাইপ নামে একটা জিনিস আছে, জানো?

শুনেছি যেন।

আছে। বিষ মাখানো ছুঁচ ভরা থাকে একটা চোঙের মধ্যে। জোরে ফুঁ দিলে সড়াক করে গিয়ে বিঁধে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অক্কা। কোন একটা ডিটেকটিভ বইতে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায়।

তা হবে। কিন্তু ওসব নিয়ে কেন ভাবছেন?

ঝম্পটিবাবু এবার একটু খিঁচিয়ে উঠে বললো, ভাবব না কেন? অস্ত্র নিয়ে আজকাল কে না ঘোরে বলো তো! ছেলেছোকরাদের পকেটে আজকাল সবসময় পিস্তল আর ছোরাছুরি থাকে, তা জানো?

বিজয় একটু হাসল। বলল, তা থাকতে পারে। কিন্তু আমরা অস্ত্র পেলেও তো কিছু করতে পরব না ঝম্পটিবাবু। আমাদের কলিজার সেই জোর নেই।

সেইজন্যই তো দূর থেকে চালানো যায় এমন অস্ত্র খুঁজছি।

সাদা, ক্ষয়াটে খর্বুটে চেহারার ঝম্পটিবাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে ভারী মায়া হল বিজয়ের। কিন্তু হাসি পেল না। আশ্চর্যের বিষয়, মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্রের কথা সে নিজেও ভাবে। একটা রিভলবার বা পিস্তল থাকলে যে ভাল হয়, একথা সে কি ভাবেনি? বহুবার ভেবেছে। সাবমেশিনগানের ছবি দেখেছিল টাইম ম্যাগাজিনে। খুব শখ হয়েছিল, আমার যদি একটা থাকত!

ঝম্পটিদা, তার চেয়ে বরং একটা পিস্তল কিনুন।

পিস্তল! দূর! লাইসেন্স দেবে না।

লেগে থাকলে একদিন পেয়ে যাবেন।

বড় শব্দ হয় যে! আমি চাই নিঃসাড়ে কাজ সারতে।

বিজয় একটু হেসে বলে, কিন্তু মারবেনটা কাকে ? যার কথা বলছেন সে তো আমার বন্ধু। তার অনেক গার্ল ফ্রেন্ড।

রেখে দাও গার্ল ফ্রেন্ড। ছোঁড়া এই দোতলার বারান্দার দিকে কিরকম খাই-খাই চোখে তাকায় জানো ?

বিজয় একটু স্তিমিত গলায় বলল, আপনি বউদিকে খুব ভালবাসেন, না ?

ঝম্পটিবাবু শুকনো গলায় একটু কাশলেন। তারপর বললেন, কী জানি! তবে মাগী বড় পাজি। বুঝলে। কেন, তোমরা জানো না ?

বউদি পাজি হবে কেন ? খুব ভাল মেয়ে। নইলে কি আপনি বউদিকে রাহুর মতো ভালবাসতেন ?

রাহু ? কথাটা কি ভাল শোনাচ্ছে ?

খারাপ কি ? রবীন্দ্রনাথের রাহুর প্রেম বলে কবিতা আছে, পড়েননি ?

নাঃ। ওসব কবিতাটবিতা তোমরা পড়ো গে। আমি জ্বলে মরছি নিজের জ্বালায়।

ভালবাসার মেলা হাঙ্গামা ঝম্পটিদা। সেই কোথাকার মোগলাই পরোটা. কোথাকার রোল, কোন দোকানের শাড়ি, কোথাকার চটি সব বয়ে আনতে হয়। মাথা টিপতে হয়, পা দাবাতে হয়, আরও কত কী করে লোকে!

ঝম্পটিবাবু এবার একটু হাসলেন, খুব ঠেস দিচ্ছো! আরে ওসব করি কি আর সাধে! মাগীকে হাতে রাখি। এ বয়সে যদি কোনও ছোকরার সঙ্গে ভেগে পড়ে তো আমি চিত্তির। দেয়াথোয়াটা ভালবাসা নয় হে, ঘুষ।

বিজয় একটা হাই তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, থাকগে, রিভলবারটা কিনে ফেলুন। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও ভেবে দেখলাম, সব মানুষেরই কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকা ভাল।

অনভ্যাসের ব্যায়াম আর যোগাসনের ফলে সারা গায়ে একশ ফোড়ার ব্যথা। জগিং করেছিল, ঊরু আর পায়ের ডিম গুটিয়ে শক্ত মেরে আছে। নড়তে চড়তে চিড়িক মেরে ওঠে শরীরের সব জায়গায়। জিমির মতো স্বাস্থ্য তার কোনওদিনই হবে না, তবু এই কমজোরি চেহারায় যতটা প্রাণসঞ্চার করা যায় তার চেষ্টায় মেতেছে বিজয়। কিন্তু তার জন্য যে এরকম মাশুল দিতে হবে তা জানা ছিল না। খামোখা শরীরটাকে কষ্ট দিচ্ছে না তো! স্বাস্থ্য যদি না ফেরে ? যদি আরও দড়কচা মেরে যায় ?

ব্যাংক লোনের জন্য একটা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির প্রোজেক্ট প্ল্যান তৈরি করতে

হবে। জব ওরিয়েন্টেড হওয়া চাই। আকাশ-পাতাল ভেবেও কী প্রোজেক্ট করবে তা বুঝতে পারছে না। কখনও মনে হয়, লেদ মেশিন। কখনও মনে হয় প্রেস। কখনও মনে হয়, ফ্রুট জুস বা সফট ড্রিংকস।

জিমি তাকে বলেছে, ভিডিও ক্লাব খুলতে। ভিডিও ক্যাসেট বা ভিডিও যন্ত্র ভাড়া দিয়ে টাকা তো আসবেই। দিনের বেলা বাচ্চারা পয়সা দিয়ে ভিডিও গেমস্ খেলে যাবে। সন্ধেবেলা বাচ্চাদের মা-বাবারা দেখবে ভিডিও ফিল্ম। রাত্রে কামুক ও নিস্তেজরা আসবে এক্স, ডাবল এক্স বা ট্রিপল এক্স মার্কা সেক্সি ছবি দেখতে।

পারবে কি বিজয়?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে বুকের পাঁজরে খিচ ধরল ব্যথায়। ককিয়ে উঠে সে পাশ ফিরল। ফিরতেই পাশ বালিশ। যতবার পাশবালিশ স্পর্শ করে ততবার মেয়েদের কথা মনে হয়। কোথায় থাকে যুবতী মেয়েরা, কোন স্বর্গে তাদের বাস? আজ অবধি বিজয়ের কোনও প্রেম হল না, মেশামেশি হল না। অথচ কত যুবকের কত মেয়ে-বন্ধু থাকে!

মেয়েদের কথা চিন্তা করতে করতেই রোজ তার ঘুম আসে। আজ আসছিল না। আজ নারীচিন্তায় আরও দুটো ভেজাল ঢুকেছে। ব্যায়াম আর প্রোজেক্ট প্ল্যান। টেবিল ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া আছে। সাড়ে চারটেয় বেজে উঠবে। পার্কসার্কাস অবধি দৌড়। ওঃ, কী কষ্ট!

সর্বাঙ্গ সেই যে কেঁপে গিয়েছিল তিথির, সে-ই কাঁপন এখনও তার শরীরের প্রতিটি তন্ত্রীতে ছড়িয়ে আছে। এমন চমকে গিয়েছিল যে এখনও ধুপধুপ শব্দ হয় বুকে। স্কুটারে সে কখনও চড়েনি আগে। কেউ তো চড়ায়নি। স্কুটারওলা কোনও ছেলের সঙ্গে ভাব হয়নি কখনও। প্রথম চড়াল জিমি। খুব ভয়ে ভয়ে উঠেছিল। তারপর দেখল, খারাপ লাগে না তো। খোলা হাওয়ায় চুল ওড়ে, আঁচল ওড়ে, নাকে তীব্র বাতাস ঢুকে দম বন্ধ করে দেয়। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার। একদিন, দুদিন, তিনদিন·

অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল তিথির।

তা বলে এমন নয় যে, জিমির স্কুটারের পিছনের সিটটা তারই পাকাপাকি দখলে। বরং সে চান্স পায় কমই। তিথির অন্যান্য ল্যালা বন্ধুরা যা হ্যাংলামি করে স্কুটারে চড়ার জন্য যা বলবার নয়। জিমির পিছনে বসে ওরা যেন কোন

স্বর্গে উঠে যায়।

তিথি ওরকম করে না কখনও। সে বুঝে গেছে, জিমির জন্য হ্যাংলামি করে লাভ নেই। ওই ভীষণ প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না সে। তাই সে দলছুট হয়ে গেছে কবে। তার মেয়েলি অহংকারে লাগে ওই প্রতিযোগিতায় নামতে। তা বলে মন থেকে জিমির ছবিটা তুলে ফেলাও যায়নি এখনও।

কাল জিমি এসে বলল, তুমি সুধীর ভট্টাচারিয়াকে চেনো? আর্টিস্ট!

চিনি। আমার বাবার বন্ধু। কেন?

অ্যাকাডেমিতে ওব একটা একজিবিশন হচ্ছে। যাবে?

আমি বাবা মডার্ণ আর্ট কিছু বুঝি না।

আরে, চলোই না। আমার একটু ইনট্রোডাকশন দরকার। সুধীর ভট্টাচারিয়া টিভি-র জন্য শর্ট ফিলম্ তোলার কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। আই মে গেট অ্যান ওপেনিং।

তাহলে যাবো।

কলেজ থেকে তুলে নেবো তাহলে। তিনটেয়।

চালু ছেলে। কয়েক মিনিটেই সুধীর কাকুকে মজিয়ে ফেলল। শর্ট ফিলমে চান্স পাবে কিনা সেটা অন্য কথা, কিন্তু সুধীর কাকু যে ইমপ্রেসেড তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ফেরার পথেই ঘটে গেল সেই ভীষণ কাণ্ডখানা। ল্যান্সডাউন রোড ধরে মসৃণ ছুটছিল স্কুটার। আচমকাই একটা দোল, তারপরই টাল খেয়ে স্কুটারটা বাঁ দিকে পড়ো-পড়ো হয়ে ছুটে গিয়ে ধাক্কা খেল এক যুবকেব শরীরে। এক তীব্র ঝাঁকুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল তিথির, মাথা বিহ্বল। জিমির কাঁধ আঁকড়ে ধরে এক জৈব তাগিদে সে ছিটকে পড়া থেকে বাঁচাতে পেরেছিল নিজেকে। কয়েক সেকেন্ড বোধহয় তার চোখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

চোখ মেলে সে দেখতে পেল, রাস্তার মাঝখানে লম্বা ও লকলকে চেহারার একটি ছেলে পড়ে আছে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। স্কুটারটা এত জোরে ধাক্কা মেরেছে ওকে যে সেই ধাক্কার উল্টো প্রতিক্রিয়া স্কুটারে বসেই টের পেয়েছে তিথি। ছেলেটার ওই উঠবার চেষ্টা ও পড়ে-যাওয়া এবং ফের উঠবাব চেষ্টা দেখে কষ্টে তিথির চোখে জল এসে গিয়েছিল। বোধহয় কোমর ভেঙেছে, বা পাঁজর। তবু অহংকারী ছেলেটা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

জিমি একটুক্ষণ দৃশ্যটা দেখেই বলল, লেট মি হেল্প হিম।

নেমে যাচ্ছিল।

কিন্তু তিথি কলকাতাকে চেনে। লোকজন দৌড়ে আসছে। এক্ষুনি ভীড় হয়ে

যাবে। তারপর ক্ষিপ্ত জনতা কী করবে তার তো ঠিক নেই। আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে জিমিকে ডেকেছিল, জিমি, কাম ব্যাক। দি ক্রাউড উইল কিল ইউ। গেট আস স্ক্র্যাম, গেট আস স্ক্র্যাম।

খুব সম্প্রতি তিথি একটু-আধটু ইংরিজি শিখেছে। কেন যে উত্তেজনার মাথায় ইংরিজিটাই মুখে এসে গেল!

ভয় পেয়ে জিমি ফিরে এল। স্কুটারে উঠে বুদ্ধিমানের মতো কেটে পড়ল তারা।

জিমিকে সবাই যে ভালবাসে তার কারণ জিমি সবাইকেই মূল্য দেয়। হয়তো স্বার্থ আছে। তবু দেয় তো!

ছেলেটাকে ওরকম ভাবে আহত করে সে পালিয়ে যেতে চাইছিল না মোটেই। রাসবিহারীর মুখে এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি চলে যাও। আমি ফিরে যাচ্ছি।

কিন্তু জিমি···

জিমি অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলল, দিস ইজ মাই ফার্স্ট অ্যাকসিডেন্ট। অ্যান ইভেন্ট টু রিমেম্বার। আমি ছেলেটাকে একটু দেখে আসি। আমার হেলমেট ওইখানে পড়ে আছে।

তিথি নেমে পড়ল। নেমে পড়ে বাঁচল। স্কুটারে আর নয় বাবা। তার সর্বাঙ্গে কাঁপন। মাথা উদ্‌ভ্রান্ত। বুকে অস্থিরতা। আজ চব্বিশ ঘণ্টা পরও সেই অস্থিরতা রয়ে গেছে।

রাস্তার মাঝখানে লম্বা চেহারার এক আহত যুবক বারবার উঠবার চেষ্টা করছে, বারবার পড়ে যাচ্ছে—দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না তিথি। হন্টিং। যত দৃশ্যটা মনে পড়ছে তত অস্থিরতাটা কামড়ে ধরে তাকে। ছেলেটা বোধহয় এখন হাসপাতালে। হয়তো অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। কে জানে বাঁচবে কিনা।

কিন্তু তিথির মন বলছে, বাঁচবে। যে তীব্র প্রাণশক্তিবলে ছেলেটা নিজেকে টেনে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল তাতে মনে হয় সহজে হার মানার ছেলে নয়।

জিমি ছেলেটার কাছে ফিরে গিয়েছিল। তারপর কী হল তা আর জানে না তিথি।

দুই বোন এক ঘরে। মেয়েদের একটা সুবিধে, বয়সের ব্যবধান বা সম্পর্ক যাই হোক, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যেতে দেরী হয় না। পূর্বা আর তিথি অনেকটা তাই। দিদিকে তিথির সবচেয়ে বেশী বন্ধু বলে মনে হয়।

রাতে শোয়ার আগে দুই বোনে কিছু কথা হয়। হাসির কথা, অ্যাডভেঞ্চারের

কথা, ছেলেদেব নষ্টামি–দুষ্টুমির কথা। প্রায়ই আড়াল বা রাখঢাক থাকে না।

পূর্বা জিজ্ঞেস করলো, খুব উড়ছিস নাকি আজকাল?

না রে। উড়ব কার সঙ্গে? কে আছে বল!

জিমিটা এক নম্বরের বিচ্ছু কিন্তু।

ঠোঁট উল্টে তিথি বলে, জিমি! ওর এত বান্ধবী যে পাত্তাই পাওয়া যায় না।

খুব সেক্সি নাকি?

কি জানি। মনে তো হয় না। তুই কিছু বুঝিস না?

পূর্বা অবাক হয়ে বলে, আমি কী বুঝব? ধ্যাত্। কী যে বলিস!

আহা, তোর কাছে তো খুব লক্ষ্মী ছেলে হয়ে রোজ বাংলা শেখে। তাকাতাকি হয় না? হাসাহাসি!

তা কি আর হয় না! তবে সে ওই সারফেশিয়াল। আমি তো জানতাম ও তোর সঙ্গে লটকে গেছে। যদি ভগ্নীপতিই হয় কখনও সেই ভয়ে··

দুই বোনে খুব হাসল। তারপর তিথি বলল, পাগল। ওকে বিয়ে করে কোন বোকা! বিয়ের পরও তো ওর বান্ধবী থাকবেই একগাদা। ওটা বাবা সহ্য করা যায় না।

হ্যান্ডসামদের নিয়ে ওই বিপদ। আজ আসার কথা ছিল জিমির। ওকে 'পল্লীসমাজ' পড়তে দিয়েছি। আজ এসে পড়া দেওয়ার কথা।

তিথি চোখ বড় বড় করে বলল, এর মধ্যেই বাংলা পড়তে শিখে গেছে?

গড়গড় করে।

বলিস কী রে? তুই তো সাঙ্ঘাতিক।

ছেলেটাও খুব ইন্টেলিজেন্ট। আজ এল না বলে ভাবছি, কী হল। সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করে না তো!

কাল তো অ্যাকসিডেন্ট স্পটে ফিরে গিয়েছিল। কে জানে বাবা, লোকেরা চিনতে পেরে ধোলাই দিয়েছে কিনা। আমি বারণ কবেছিলাম, শুনল না।

যাঃ, জিমিকে কেউ ধোলাই দেবে না। যা পটাতে পারে লোককে। হ্যান্ডসাম হওয়ায় ওটাও একটা সুবিধে, টক করে লোকে গায়ে হাত তোলে না। পরশুদিন আমাদের ট্রেনের কামরায় একটা মেয়ে খুব চেঁচামেচি করছিল, কোন ছেলে তার বুকে হাত দিয়েছে বলে। কামরায় প্যাসেঞ্জাররা হৈ-চৈ করল। যে ছেলেটা হাত দিয়েছিল ভারী সুন্দর দেখতে। কী মায়াবী মুখখানা। আর স্মার্টও খুব। এমন নরম গলায় বলল, আমি কোনও দোষ করিনি, তবু যদি চান তো আমাকে মারুন আপনারা। ব্যস! ওতেই সবাই গুটিয়ে গেল। একেবারে জল।

মেয়েটা দেখতে কেমন ছিল?

শ্যাওড়া গাছের পেত্নী। সুনীতিদি তো ঠাট্টা করে বলল, ও ছেলে যে ওর গায়ে হাত দিয়েছে সেটাই তো ওর বাপের ভাগ্যি। আবার সতীপনা দেখাচ্ছে দেখ। আমার তো বিশ্বাস মেয়েটা বানিয়েই বলছিল। কুচ্ছিত মেয়েদের নানারকম কমপ্লেক্স থাকে তো।

তোর গায়ে কেউ কখনও হাত দিয়েছে দিদি?

পূর্বা একটু হাসল, তোর গায়ে বুঝি দেয়নি?

পুরুষগুলো যা হ্যাংলা না রে দিদি। বিশেষ করে মাঝবয়সীগুলো। বাসে-ট্রামে দেখবি জায়গা থাকলেও গা ঘেঁষে দাঁড়াবে।

আর বলিস না ওদের কথা। সেদিন পিছন থেকে-

কিছু বললি না কেন?

এত ভীড় যে লোকটাকে মার্ক করা যাচ্ছিল না। আর ভীড়ের মধ্যে ঝগড়া করতে লজ্জাও তো করে। সয়ে নিই।

আমি বাবা সহ্য করি না। একদিন থাপ্পড় তুলেছিলাম একটা ছেলেকে। চোরের মতো মুখ করে সরে গেল।

এসব গা-চাটা পুরুষগুলোকে দেখলে গা ঘিনঘিন করে ওঠে। তবে অনেক মেয়েও আছে এসব এনজয় করে।

কিন্তু আমরা কী যেন একটা বলছিলাম রে দিদি। কথায় কথায় ভুলেই গেছি।

জিমির কথা।

তিথি খিলখিল করে হেসে বলল, আমাদের বেশ ক'দিন ধরে জিমিতে পেয়েছে। ভূতে পাওয়ার মতো।

ভূতটা তোকেই ধরেছে বেশী।

না রে দিদি। প্রথম প্রথম একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আর ততটা নয়।

স্কুটারে চাপছিস। এখানে সেখানে যাচ্ছিস।

ও সবাই চাপে। আমি সবচেয়ে কম।

জিমি তোকে কখনও চুমুটুমু···

না, মাকালীর দিব্যি। আসলে কী জানিস, ও মেয়েদের সঙ্গে মেশে, হুল্লোড় করে, সব ঠিক, কিন্তু বেশী ডেপ্‌থে যায় না। একদিন আমাকে বলেছিল, স্কুলের নিচু ক্লাসে যখন পড়ত, তখন থেকে নাকি মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশা। মনে হয় এখন আর কারও সঙ্গে বেশী জড়াতে চায় না।

খুব ক্যারিয়ারিস্ট কিন্তু।

জানি। ওর হবেও। দেখিস সিনেমায়-টিনেমায় হিরো হয়ে যাবে।

পাশের ঘরের ভেজানো দরজায় ওপাশ থেকে ওদের মা সুনীতা ডাক দিয়ে বললেন, কী অত কথা হচ্ছে রে তোদের ? রাত হয়েছে, ঘুমো। কথার চোটে আমার বায়ু বেড়ে গেল।

তিথি জিব কেটে বলল, এমা, শুনতে পেল নাকি রে মা ?

না। আমরা তো আস্তে বলছি। জলের গ্লাসটা দে তো।

ঠং করে গ্লাস ওল্টাল, ছড়ছড় জলের শব্দ। সুনীতা ধমক দিয়ে বললেন, কী ফেললি ? ঘরটা জলময় হল তো! বস্তা চাপা দে।

দু বোনে হেসে খুন হল কিছুক্ষণ।

সব কথাতেই তোদের হাসি। কি যে এত হাসির পাস তোরা। বলে সুনীতা শব্দ করে হাই তুললেন।

খুব সন্তর্পণে তিথি ডাকল, দিদি, ঘুমোলি ?

না। বল।

সেই যে ছেলেটা স্কুটারের ধাক্কা খেল তার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে রে। কী জানি কী হল!

জিমি তো আসবেই। তখন জেনে নিস।

জিমি যদি ওকে গিয়ে না পেয়ে থাকে যাহলে আর কোনও খবর পাওয়ার আশাই নেই।

রাস্তায় ঘাটে ওরকম কত হয়। স্কুটারের ধাক্কায় কেউ মরে না।

খুব জোর লেগেছিল রে। পাঁজর ভাঙতে পারে।

যা হওয়ার হবে। ভেবে কী করবি। তোর তো আর দোষ নেই। এখন ঘুমো। কাল আমার স্কুল আছে।

দু বোন ঘুমিয়ে পড়ল। এবং যে যার নিজের মতো স্বপ্ন দেখতে লাগল।

জিমি এল পরদিন বিকেলে। মুখে একটু লাজুক অপরাধী ভাব।

তিথি দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখেই বলে উঠল, খুব ধোলাই হয়েছে তো!

ধোলাই! এ নিউ ওয়ার্ড। এর মানে কি ?

বিটিং আপ। পরশু তো খুব বীরত্ব দেখিয়ে ফিরে গেলে। লোকে ধরেনি তোমাকে ? মারেনি ?

জিমি হাসল, আমাকে কেউ কখনও মারেনি, একসেপ্ট মাই ড্যাড অ্যান্ড জনি। জনি আমাকে খুব পেটাত। ধোলাই। মুখ-চোখ ফাটিয়ে দিত। নাউ হি লাভস্ মি মোস্ট।

সেই ছেলেটার কী হল ?
জিমি হাসল, ভাল।
দেখা হয়েছিল ?
নিশ্চয়ই। আমি ওকে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি।
সত্যি ?
সত্যি।
যাক বাঁচা গেল। তেমন কিছু হয়নি তো ?
একটু চোট হয়েছে। বাট হি হ্যাজ লাইফ ফোর্স। ঠিক হয়ে যাবে।
তোমার খুব সাহস জিমি। আর কেউ হলে ফিরে যেত না।
তুমি মানুষকে চেনো না। বহু লোক আছে পালাতে ভালবাসে না। তোমারও একটা খবর আছে।
কী খবর ?
ছেলেটা কী বলেছে জানো ?
কী বলেছে ?
তোমার সঙ্গে যেন না মিশি।
তিথি চোখ কপালে তুলে বলল, তার মানে ?
বলছিল, ওই মেয়েটার সঙ্গে আপনি মিশবেন না। আপনার গুণগুলো ও নষ্ট করে দেবে।
কেন বলেছিল ?
তুমি যে আমাকে পালিয়ে আসতে বললে, সেইজন্য।
খুব আস্পদ্দা তো ছেলেটার। ও ওসব বলার কে ?
হি ওয়াজ হার্ট। শরীরে তেমন নয়। মনে। খুব দুঃখ পেয়েছিল তোমার ব্যবহারে।
তা বলে মিশতে বারণ করবে ? ঠিক আছে, মিশো না আমার সঙ্গে।
আমার ডিসিশন তো তা নয়। রাগ করলে নাকি ? জোজো ইজ এ গুড বয়।
জোজো কে ?
মাই ভিকটিম।
ছোঃ, জোজো একটা নাম হল ?
ওর আর একটা নাম আছে। অমল চক্রবর্তী।
তুমি বাড়িতে গিয়েছিলে ?
হ্যাঁ।
খুব জমিয়েছো নিশ্চয়ই।

মিনস্ ?

মানে খুব আড্ডা দিলে নাকি ?

একটু হল। জোজো হ্যাজ এ বিগ ফ্যামিলি। শোনো, তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো ওর কাছে।

পাগল হয়েছো ? আমি যাবো কেন ?

তুমি যে খারাপ নও, ও যা ভাবছে তা নও, সেটা দেখিয়ে দিয়ে আসবে।

তিথি ধরা গলায় বলল, এমনি তো বলিনি। কলকাতার রাস্তার লোকগুলো যে ভীষণ খারাপ। এমন গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দেয় কিছু হলেই!

রাস্তার লোকেরা তো আমরাই। না ?

মোটেই না। রাস্তার লোক রাস্তারই লোক।

আচ্ছা বাবা আচ্ছা। একদিন যাবে চলো।

না, কেন যাবো ?

আরে চলো তো সহী।

কভি নেহি।

ঠিক আছে বাবা। হ্যাঙ উইথ জোজো।

তুমিও যাবে না।

আমি ! আমি কেন যাবো না ?

ও আমাকে অপমান করেছে। তুমি আমার বন্ধু, তোমারও ওর কাছে যাওয়া উচিত নয়।

জোজো ইজ নাউ মাই ফ্রেণ্ড।

তোমার যাওয়া উচিত নয়। বলে তিথি তড়িৎ-পায়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

জিমি জানে মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তেল দেওয়া বৃথা। চোখ রাঙানো বৃথা। ওভাবে হয় না। কিন্তু খুব সাবধানে যদি হ্যান্ডেল করা যায় তবে মেয়েদের ইচ্ছেমতো বাঁকা করো, সোজা করো। নো প্রবলেম। কিন্তু সাবধানে, খুব সাবধানে। এত ডেলিকেট, এত অবুঝ, এত সুইট মেয়েরা, কিন্তু যদি ধৈর্য ধরো এবং সূক্ষ্মভাবে এগোও, তাহলে যা খুশি করাতে পারো মেয়েদের দিয়ে। এনিথিং। এভরিথিং।

জিমি একটু শিউরেও উঠল। মেয়েদের নিয়ে এই বয়সেই তার কী বিপুল অভিজ্ঞতা। তবু কে জানে, যদি কোনওদিন সে বিয়ে করে তবে তার বউ হবে পৃথিবীর সবচেয়ে আনহ্যাপী উওম্যান। কে জানে। ওটাই নিয়তি।

পূর্বা ঘরে এসে ঢুকল। মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে গভীর দৃষ্টি। কিছুক্ষণ কথা না বলে সে পান করল জিমিকে, তার দুই চোখ দিয়ে। এ জন্মে তার বিয়ে হবে কিনা

কে জানে। বয়স হল। মন কিছু চায়। বড় আঁকুপাঁকু করে।

পল্লীসমাজ পড়েছো জিমি ?

পড়েছি। কিন্তু কী হল জানেন। আই অলরেডি রেড ইট ইন হিন্দি।

হিন্দিতে ?

নামটা মনে ছিল না। গল্পটা পড়তেই মনে পড়ে গেল। শরৎচন্দ্র। আমি ভাবতাম শরৎচন্দ্র হিন্দিওয়ালা।

না। পদবী চট্টোপাধ্যায়। আমাদের মতো।

আপনারা কি রিলেটেড ?

আরে না। বোসো, তোমার পড়া ধরি।

ধরুন। শরৎচন্দ্র ইজ ভেরি রিডেবল্। আর বই নেই ?

আজ দেবো শ্রীকান্ত ফার্স্ট পার্ট। কাল এলে না কেন ?

কাল হঠাৎ দিল্লি থেকে মর্নিং ফ্লাইটে পিতাজি জুমিং ইন করলেন। ঝং করে এসে হাজির। তারপর দু ভাইকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে ঘণ্টাভর সাব-মেশিনগান চালিয়ে দিলেন ট্যারারা ট্যাট ট্যাট, ট্যারারা ট্যাটট্যাট। উই আর গুড ফর নাথিং, উওম্যানাইজিং, সোশ্যালাইজিং, ড্রিংকিং এট্‌সেটরা। বিজনেস এক্সপ্যান্ড করছে না। কাল দুই ভাই একদম আউট। বিকেলের ফ্লাইটে হি জাস্ট বুমড্ আউট। এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে জনি বহুৎ ড্রিংক করল, আর আমি স্টিরিও ছেড়ে শুয়ে পড়লাম।

জোজো সমীপে কয়েকটি চরিত্র

সুহৃদ এলো তিন দিন পর।

কী রে, কী খবর ? শুনলাম নাকি অ্যাকসিডেন্ট করেছিস।

খুব কিছু নয়। তবে ভোগাবে। মাজা বলে কথা।

আমার ধর্মে-টর্মে বিশ্বাস নেই, কর্মফলও মানি না। তবু দ্যাখ, তুই পার্টি ছাড়ার ডিসিশন নিলি, আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হল। যদিও কাকতালীয়, তবু ভেবে দ্যাখ অ্যাকসিডেন্টটা কী ইণ্ডিকেট করছে।

সুহৃদ, বেশি বকিস না। তোকে আমি একদিন দেখেছি কালীমূর্তি প্রণাম করতে।

কবে দেখেছিস ? মারব ঝাপট।

পোটো পাড়ায় নোনাদার বাড়ি যাওয়ার সময়। তুই টপ করে একটা হাত

কপালে ঠেকালি।

কপালে হাত ঠেকালেই প্রণাম হয় নাকি। হয়তো কপালে মাছি বসেছিল, তাড়িয়েছি।

তুই অভ্যাসবশে প্রণাম করেছিস, হয়তো টেরই পাসনি।

আমি ইল্লজিক্যাল নই। তোর কথা সত্যি হতেও পারে। যদি করেই থাকি, কনশাসলি করিনি। বাপ-ঠাকুর্দার সংস্কারবশে হয়তো করে ফেলে থাকতেও পারি। কিন্তু তাতে কী? এইসব সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইও তো করছি। কালীকে প্রণাম করলে কিছু হয় এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না।

দলবাজিও একটা সংস্কার, একটা অন্ধ বিশ্বাস।

যেমন? উদাহরণ দে।

পার্টি হাইকমান্ড যখন যে ডিসিশন নিল সঙ্গে সঙ্গে সেটা তোরা ধ্রুব সত্য বলে ধরে ফেলিস আর তেমনি নাচিস।

বাঃ, লীডারশীপ মানব না?

কেন মানবি? তাহলে গুরু মানিস না কেন?

গুরু? মাই গড! ওই ভণ্ড, জোচ্চোর...

ভণ্ড, জোচ্চোর লীডাররা নয়? তারা পার্টির চাঁদায় খায় না?

তা বলে...

শোন, তোকে একটা ঘটনা বলি। হাড়োয়া নাম শুনেছিস? সুন্দরবনের বাদায় কোথায় যেন। সেখানকার এক গ্রামের এক বিধবার একটা মাত্র মেয়ে। গানটান গায়, একটু-আধটু অভিনয় জানে। অঞ্চলপ্রধান তাকে জাতে তুলতে এখানে সেখানে নিয়ে যেত ফাংশন করাতে। একবার এরকম ফাংশন করতে আসে অশোকনগরে। রাত বেশী হয়ে গেছে অছিলায় তাকে নিয়ে রাত কাটায়। মেয়েটা প্রেগন্যান্ট হল। অঞ্চলপ্রধান মেয়েটাকে বলল, তোকে তো বিয়েই করেছি, ভয় কি? মেয়েটা বলল, বিয়ে কখন করলে? অঞ্চলপ্রধান বলল, আরে ওই শোয়াটাই তো বিয়ে, আমরা তো অনুষ্ঠান মানি না। আমাদের বিয়ে ওরকমই। তবে খসিয়ে ফেল, ব্যবস্থা করছি। সেই ব্যবস্থা হয়েও গেল। তারপর আর একদিন লোকটা মেয়েটাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে লাইগেশন করাতে নিয়ে গেল একটা হেলথ্ সেন্টারে। ডাক্তারটা কিছু অনুমান করেছিল। মেয়েটাকে আড়ালে জিজ্ঞেস করল, আপনার কটা বাচ্চা? মেয়েটা বলল, একটাও নয়। ডাক্তার বলল, তাহলে লাইগেশন কেন করাবেন? মেয়েটা লাইগেশান বোঝে না। ডাক্তার বুঝিয়ে বলাতে সে ফুঁসে উঠল, কই, আমাকে তো সে কথা বলে আনেনি! শুধু বলেছে শরীরটা সারাতে হবে বলে চিকিৎসা দরকার। তখন

ডাক্তার একটু দুষ্টুমি করে লাইগেশন না করেই ছেড়ে দিল মেয়েটাকে, শুধু বলে দিল, সাবধান, স্বামীকে যেন কিছু বলবেন না। জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে, ছোট্ট একটা অপারেশন করে দিয়েছি।

তুই এত ডিটেলস্-এ বলছিস কেন ? অ্যাজ ইফ...

শোন না। কেসটা অংশুদার কাছে রেফারড্ হয়। বিধবা মহিলা প্রতি সপ্তাহে আসতেন।

তারপর কী হল ?

অঞ্চলপ্রধান তো বোঝেনি যে লাইগেশন হয়নি। মেয়েটা সেকেন্ড টাইম প্রেগন্যান্ট হল। মেয়েটার মা তো অঞ্চলপ্রধানকে ধরে পড়ল, বিয়ে এবার না করলেই নয়। লোকটা, 'ঘর দেখছি' বলে কেটে পড়ল। শোনা গেল তার আগের বউও আছে একজন। এ মেয়েকে বিয়ে করলে ফেঁসে যাবে। আর মেয়েটা তার প্রেগন্যান্সির খবর চেপে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার নষ্ট করতে চায়নি পাপটাপের ভয়ে। সাত মাস যখন চলছে তখন মেয়েটার মা শোরগোল তুলল। কিন্তু কে শুনবে তার কথা ? সবাই বলে মিটমাট করে নাও। অঞ্চলপ্রধান বলে কথা! তার তো একটা ইজ্জত আছে। কিন্তু বিধবাটি বলে, এর আর মিটমাট কী ? বিয়ে না হলে মিটমাট হবে কী করে ? মহিলা কলকাতায় এসে মেলা ধরাধরি করল একে-ওকে-তাকে। পার্টি বিরক্ত, বিব্রত। অংশুদার ওপর ভার পড়ল ব্যাপারটা দেখার। অংশুদা কী করল জানিস ? বিধবাটিকে বলল, মাসে মাসে দুশো টাকা করে অঞ্চলপ্রধান তোমাদের দিতে চাইছে। আমি বলি কি, ওটা নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল। বাদা বনে তো আর সমাজের তেমন ভয় নেই। বাচ্চাটা হোক, মানুষ কোরো।

সাজানো কেস।

মানে ?

এরকম অনেক কেস শোনা যায়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে মেয়েটা স্রেফ একটা ভাল ওয়ার্কারকে জব্দ করতে এ কাজ করেছে।

সেইজন্যই তো অন্ধবিশ্বাসের কথা বললাম। অংশুদাও ওই কথাই বলেছিল প্রথমে। তারপর ওই গ্রামের দু-একজন যখন বুড়ির কথায় সায় দিল তখন অংশুদা খুব রেগেই গেল বুড়ির ওপর। যেন দোষটা ওদেরই।

তাতে কী প্রমাণ হল ?

হল এই যে, অংশুদা যদি পার্টি না করত এবং ওই বদমাসটা যদি পার্টির লোক না হত তাহলে ঠিক এরকম আপোষ করার কথা অংশুদার মত লোক ভাবতেই পারত না। পার্টি ওয়ার্কার এরকম কাজ করতেই পারে না, আর যদি

করেই ফেলে তবে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। আর যদি ফাঁসানোই হয়ে থাকে তবে তাকে বাঁচানোই উচিত। এটাই হল সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস। ভণ্ড কি তোরা কম ?

গাঁয়ে এসব ঘটত অনেক আগে, সেই শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'-র আমলে। এখন আর গাঁয়ের মেয়েরা অত বোকা নেই।

এই তো পার্টির উপযুক্ত প্রতিনিধির মতো কথা বলছিস। বাঃ।

তুই যুক্তিতে আসছিস না কেন ?

যুক্তি ? ওটা একটা যুক্তি হল ? গাঁয়ের মেয়েরা অত বোকা নেই, এটা তো বিশ্বাসের কথা। যুক্তির কথা তো নয়। গাঁয়ে শহরে এরকম হাজারো বোকা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ ফিলম্ স্টার হতে চায়, নর্তকী, গায়িকা হতে চায়, লেখক কবি হতে চায়, বা নিছক দুমুঠো ভাত আর কাপড়ের সিকিউরিটি চায়। এইসব মেয়েকে যে ক্ষমতাবান বদমাসরা যথেচ্ছ কাজে লাগায় তা তুইও জানিস। কিন্তু তবু তুই একজন অঞ্চলপ্রধানের পক্ষ নিচ্ছিস, তাকে না চিনেও। কারণ ওই অঞ্চলপ্রধান তোর পার্টির লোক। এটা যদি সংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস না হয়ে থাকে তবে আর কী হতে পারে ?

শোন, ঘটনাটা ঘটেনি এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু ব্যাপারটা ফ্রেমিং কিনা তাও তো দেখা দরকার। আর মেয়েটা প্রথমবার প্রেগন্যান্ট হয়েছিল ঠিক আছে, কিন্তু সেকেন্ড টাইম হওয়াটা একটু অস্বাভাবিক না ? ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায় ?

যার বেলতলায় বাস সে কোথায় আর যাবে ? আমরা সবাই ন্যাড়া এবং বিপজ্জনক বেলতলা ছাড়া আমাদের যাওয়ার কোনও চুলোও নেই। কিন্তু তোর জন্য আমার মায়া হচ্ছে। কী অসহায়, দুর্বল তোর মুখচোখ। কী শিশুর মতো তুই পার্টিকে বিশ্বাস করিস। পক্ষপাত এতই গভীর যে ন্যায়-নীতি ভাল-মন্দের বোধ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে।

আচ্ছা, আচ্ছা, ওসব কথা থাক। আমারই ভুল হয়েছিল পার্টির কথা তুলে। এখন বল অ্যাকসিডেন্টটা কী করে হল। শুনলাম নাকি স্কুটারওয়ালা নিজে তোকে তুলে এনে পৌঁছে দিয়ে গেছে !

হ্যাঁ, ছেলেটা দারুণ, কিন্তু মেয়েটাই ছিল নষ্টের গোড়া।

মেয়ে ! এর মধ্যে আবার মেয়ে এল কোত্থেকে ?

ব্যাক সীটে একটা মেয়ে ছিল। প্রথমবার অ্যাকসিডেন্ট করে ছেলেটা যখন আমাকে হেল্প করতে আসছিল তখন মেয়েটাই ওকে চিৎকার করে বারণ করে। ছেলেটাও ঘাবড়ে পালিয়ে যায়। পরে ছেলেটা একা ফিরে আসে। হি ইজ এ গুড সর্ট। কিন্তু মেয়েটা...বাঙালী মেয়েরা কোন্ অধঃপাতে যাচ্ছে বল তো !

মেয়েদের ওপর তোর সেই বিখ্যাত বিরাগ। কেন যে মেয়েদের তুই একদম দেখতে পারিস না! নাঃ, সোহাগই তোকে একদম বিগড়ে দিয়ে গেছে।

মোটেই না। সোহাগকে আমি ভুলে গেছি।

একটুও ভুলিসনি। ভুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিস মাত্র। আর কাপুরুষরাই ওরকম করে।

কাপুরুষ! তা বীরপুরুষত্বটা কী ভাবে দেখালে ভাল হত? কেভম্যানদের মতো চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে? লীভ ইট সুহৃদ।

আমি তো এতকাল প্রসঙ্গটা তুলিনি। কিন্তু তোর সব হঠাৎ হঠাৎ পিকিউলিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় তোর মাথাটা এখনও বিগড়ে আছে। তুই যদি মিনমিনে মুখচোরা না হতিস তাহলে সোহাগের সাধ্য ছিল ওই কাণ্ড করে?

লীভ ইট সুহৃদ। আমার ভাল লাগছে না।

আরে, এখন তো ওটা ইতিহাস। যে কোনও ঘটনারই একটা পোস্টমর্টেম হওয়া ভাল। এখন আর লজ্জা কিসের? সোহাগকে আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সোহাগ আমাকে কী বলেছে জানিস? বলেছে, জোজো যে আমাকে বিয়ে করতে চায় তা তো কখনও মুখ ফুটে বলেনি, আমিও বুঝতে পারিনি।

ন্যাকা!

কথাটা কি সত্যি নয়?

আমার কিছু মনে নেই। সব ভুলে গেছি।

কিছুই ভুলিসনি। আসলে তুই এত বেশী ভদ্র আর শুচিবায়ুগ্রস্ত এবং লাজুক যে সোহাগকে ব্যাপারটা বোঝাতেই পারিসনি। ও হয়তো একটা প্রস্তাব অন্তত আশা করেছিল।

ওসব নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। ও তো ভাল ঘরে-বরেই পড়েছে। আমি প্রস্তাবটা দিয়ে গাল বাড়িয়ে থাপ্পড়টা নিইনি, সে ঠিক কথা।

তার মানে তুই বলতে চাস প্রস্তাবটা তুই দিলেও সোহাগ ওই গাঙ্গুলিকেই বিয়ে করত?

করত। মেয়েরা একটা হারামজাদা জাত।

দাঁড়া, নারী মুক্তি সমিতিকে বলে দেবো যে, তুই মেয়েদের হারামজাদা জাত বলেছিস। তারা এসে তোর চুল উপড়ে নেবে।

তোর নারী মুক্তি সমিতিকে সেই অঞ্চলপ্রধানের ঠিকানাটা দিয়ে আয় না। গিয়ে তার মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে আসুক।

নাঃ, সোহাগ তোকে সত্যিই বিগড়ে দিয়ে গেছে।

শুধু সোহাগ নয়, আমাকে বিগড়ে দিচ্ছে আরও অনেকেই। তুই, অংশুদা, তোদের পার্টি, আমার শুয়োরের বাচ্চা এমপ্লয়ার, এভরিথিং।

এবং স্কুটারের সেই মেয়েটাও ?

সেই মেয়েটাও।

অবস্থা তোর খুবই খারাপ। অ্যাকসিডেন্ট কি আর সাধে হয়েছে রে ! তুই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হযে যাচ্ছিস।

সুহৃদ চলে যাওয়ার পর একা ঘরে অনেকক্ষণ চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইল জোজো। এসময়টায় বাড়িটা বেশ ফাঁকা থাকে। দাদা বউদি অফিসে, কেয়া কলেজে। মা ঘরকন্নায় ব্যস্ত, বাবা নিজের ঘরে স্থবিরতা নিয়ে বসে। চুপচাপ শুয়ে থাকা কষ্টকর বটে, কিন্তু জোজোর তেমন খারাপ লাগছে না। কোমরের একটা এক্স-রে হয়েছে। হাড় ভেঙেনি, তবে ভীষণ পেন। নড়তে-চড়তে কষ্ট হয় বড়। তাই শুয়ে শুয়ে কেবল নানা কথা ভাবে জোজো। ভাবনার তো শেষ নেই।

কিন্তু ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে খুব বিপজ্জনক জায়গায় চলে যায় জোজো। এমন একটা জায়গায় যেখানে পাগলামির সঙ্গে স্বাভাবিকতার তফাত এক চুল মাত্র। এত পাগলাটে চিন্তা আসে কেন ? বেকার মাথা বলে ? সে ঠিক বেকারও নয়, হাফ বেকার বলা যায়। ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং নামে এক বাঙালী ফার্মে সে একটা চাকরি করে। মালিক এবং তার চামচারা সেখানে অবিরল ছড়ি ঘোরায়। দিনে দশ বারো ঘণ্টা নাকে দড়ি দিয়ে কাজ করায় তাকে এবং তার মতো আরও গুটিকয় ছেলেকে। মাইনে পাঁচশো টাকা, কিন্তু পাওয়া যায় তিন চার কিস্তিতে, এবং কবে পাওয়া যাবে তার কোন স্থিরতা থাকে না। মালিকের চামচারা বাণী দেয়, লেগে থাকো, ফিউচার ব্রাইট। এই আশ্বাসবাণী প্রথম প্রথম কাজ করত, আজকাল করে না। আজকাল জোজো মাঝে মাঝে অফিসে মাথা গরম করে ফেলে। মালিককে সে একদিন খুনও করতে পারে।

না, সোহাগকে মানাত না তার সঙ্গে। তার জীবনে। এই যে বাসা, এখানেও এক তপ্ত চাটুর ওপর বাস করা। দুপুরবেলাটায় কিছু শান্তি। কিন্তু যে-ই বউদি এল সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা এক অনির্দেশ্য আতঙ্কে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেল। এ বাড়িতে জোজো আছে মাত্র, থাকতে হয় বলে, যাওয়ার জায়গা নেই বলে। খুন করার স্পৃহাকে কতবার সংবরণ করতে হয় জোজোকে। মাঝে মাঝে খুব আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ ইচ্ছে হয়। কিন্তু ভাবে, দেখি না আর কয়েকটা দিন। কিছু যদি হয়, কিছু যদি ঘটে যায় !

কী ঘটবে ? কোন অলৌকিক ?

পেয়ে যাবে লটারির প্রাইজ ? যাঃ, বড্ড আনগ্ল্যামারাস। লটারির টিকিট জোজো কেনেই না।

তাহলে ?

একদিন হয়তো একজন বুড়ো লোক এসে বলবে, আমার কেউ নেই। আমার যা আছে, কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি, তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি।

কিংবা একদিন রাস্তায় ঘ্যাঁস করে একটা গাড়ি এসে গা ঘেঁষে থামবে আর জানালা দিয়ে সত্যজিৎ রায় তাকে ডেকে বলবেন, আরে, আপনার প্রোফাইলটা তো বেশ। আমার পরের ছবিতে...

এরকম কত কী হতে পারে!

বালিশে মাথা রেখে ক্লান্ত জোজো ধীরে ধীরে বাস্তবের সীমানা ডিঙিয়ে গেল।

★ ★ ★

কালীকিংকর দুপুরে ঘুমোতে পারে না আজকাল। ঘুমই কমে যাচ্ছে। সম্বুদ্ধর কী হবে সেইটেই আজকাল তাঁর প্রধান চিন্তা।

কিংবা তাও ঠিক নয়। সম্বুদ্ধর কী হবে তা তো জানাই আছে। তারপর কী হবে দেয়ার ? বয়স তো এখনও তার একটুখানি। লম্বা আয়ু একা একা কাটাবে কী নিয়ে ?

সেও না হয় গেল। কিন্তু আপাতত সম্বুদ্ধকে বলতে হবে, প্রি-ম্যাচিওর রিটায়ারমেন্ট নিলে সে কোনও বিশেষ বেনিফিট পাবে কিনা অফিস থেকে। বাড়তি টাকা বা বউয়ের চাকরি, যা হোক একটা কিছু। যদি পায় তবে এখনই তার সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

কিন্তু কথাটা উঠলেই সম্বুদ্ধ জানতে চাইবে, প্রি-ম্যাচিওর রিটায়ারমেন্ট কেন ? আমার কী হয়েছে ?

তখন ?

মুখের ওপর মানুষকে তো সব কথা বলা যায় না। কী করে বলা যাবে, বাপু হে, ডংকা বেজে গেছে। ঘর ছাড়ার আগে ঘরখানা যতদূর পারো গুছিয়ে রেখে যাও।

কালীকিংকর চোখ মেলে বসে সারাদিন আজ ভাবছেন। মনটা ভাল নেই। জোজোটা কোথায় স্কুটারে ধাক্কা খেয়ে এল। খবরটা সময়মতো তাঁকে দেয়ওনি কেউ। ছেলেটা বড় আনমনা, বড় দুঃখী। কে একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল, তা

সেও নাকি...

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কালীকিংকর। অজানা কোন মেয়ের জন্য মরতে গিয়েছিল ছেলেটা। যদি মরত তাহলে?

কালীকিংকর কলমটা তুললেন। ডায়েরী খুললেন। চোখে এখনও বেশ দেখতে পান।

"এখন একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমা অপেক্ষাও খারাপ অবস্থায় কত লোক আছে। যাহারা ফুটপাথে বাস করে, যাহারা সরকারী হাসপাতালে ধুঁকিতেছে, গাছতলায় পড়িয়া মরিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা আমি অনেক ভাল অবস্থায় আছি।

"ভাল ভাবিতে পারাটাই বড় কথা। ভাল ভাবিলেই ভাল। ভাল মন্দ তো মনের বিচার, ইচ্ছাশক্তি মাত্র। আজকাল সেই ইচ্ছাটাকেই বলবতী রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। সংসার যদিও আমাকে ভাঙা কুলায় আবর্জনার স্তূপে বাহুল্য বলিয়া নিক্ষেপ করিয়াছে তবু আমার চাবিদিকে এখনও চারিখানা দেওয়াল, মাথার উপব ছাদ, ইহা তো কম কথা নয়। এখনও দুইবেলা দুই মুঠা তো নিশ্চিন্তে জোটে। এই হতভাগ্য দেশে কয়জনের এত সৌভাগ্য?

"এই যে আমার বড জামাই সম্বুদ্ধ, নিতান্ত অল্পবয়সেই পৃথিবী হইতে ইহাকে বিদায় লইতে হইবে। তাহাও সহজে ঘটিবে না। তিলে তিলে, দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া বাঁচার তীব্র আকুলতা বুকে লইয়া বহুবার আশা-নিরাশায় আন্দোলিত হইয়া সকলকে ছাড়িয়া, হাহাকারে প্রিয়জনের বুক ভরিয়া বিদায় লইবে, সেই সম্বুদ্ধ অপেক্ষা কি আমি সুখী নহি? আমার ক্যানসার হয় নাই, বুড়া বয়স পর্যন্ত দিব্য বাঁচিয়া বর্তিয়া আছি।

"আমি যে ভাল আছি তাহার আর এক উদাহরণ দিতেছি। কয়েকদিন আগে এক রাত্রে আবিষ্কার করিলাম আমার নিত্যসঙ্গী রক্তচাপের ঔষধ অ্যাডেলফিন ফুরাইয়াছে। অত রাত্রে দোকানে যাওয়া যায় না। শুনিয়াছিলাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমল মাঝেমধ্যে অ্যাডেলফিন খায়। মাঝখানে তাহার প্রেশার বাড়িয়াছিল। গুটি গুটি তাহার ঘরের দিকে গেলাম। ঔষধটি না খাইলে বড়ই ক্লেশ হইবে। যতটা না শারীরিক তদপেক্ষা বেশী হইবে মানসিক বিক্ষেপ। ঘরের সম্মুখে গিয়া কেমন যেন উহাকে ডাকিতে সাহস হইতেছিল না। ভিতরে কিছু উত্তেজিত কথাবার্তা হইতেছে। ঈষৎ ফাঁক হওয়া পর্দার পাশ দিয়া ভিতরে নজর দিয়া অবস্থাটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। বউমা কী করিয়া আমার উপস্থিতি টের পাইলেন জানি না, অকস্মাৎ 'কে, কে ওখানে?' বলিয়া তাড়িয়া আসিলেন। তাহার পর আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়াই কুৎসিত

একটি ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন, 'কি রে বদমাস বুড়ো, পর্দার ফাঁক দিয়ে গোপন কথা শোনা হচ্ছে, না ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখার সাধ হয়েছে রে ?'

"অবশ্যই এ কথার পর আমার সেই রাত্রেই হার্টফেল করা উচিত ছিল। বেইমান হৃদ্‌যন্ত্র তাহা করিল না। আজও চলিতেছে। আমি কি করিয়া বাঁচিয়া আছি এবং এখনও পৃথিবীতে মুখ দেখাইতেছি ? কারণ আমি ভাবিয়া লইয়াছি. এমন মানুষ নিশ্চয়ই আছে যাহাকে পুত্রবধূর কাছে ইহা অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। শুনিয়াছিলাম কোন পুত্রবধূ নাকি শ্বশুরকে নিয়মিত প্রহার করে, এমন কি পাদুকা প্রহারও। কোন পুত্রবধূ যেন শ্বশুরকে দিয়া বাসন মাজায় এবং কাপড় কাচায়। এইসব নানা ঘটনা স্মরণে আনিয়া ভাবিলাম, আমি তো উহাদের অপেক্ষা ভাল আছি।

"পৃথিবীর গতি কোনদিকে তাহা আজ আর আমার অনুধাবন করার সাধ্য নাই। মস্তিষ্কে কুয়াশা জমিতেছে, বার্ধক্যে দৃষ্টিভঙ্গি আবিল হইতেছে, চিন্তার গভীরতা কমিতেছে। এই পৃথিবীর সহিত যোগসূত্রটি বড়ই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তাই আর সমাজ-সংসারের ভাল-মন্দ লইয়া চিন্তা করি না। শুধু নিরন্তর নিজেকে ভাল রাখিবার চেষ্টা করি তুলনামূলক ভাবে। এইভাবেই আর কয়েকটা দিন কাটিয়া যাইবে।

"পুত্রবধূ যেমনই হোক, তাহার শিশুপুত্রটি তো 'দাদু' বলিয়া আসিয়া আজও হাত ধরে। বেড়াইতে লইয়া যাওয়ার জন্য টানাটানি করে। তাহার মুখ চাহিয়া তাহার দুর্বিনীত মাতাকে ক্ষমা করা কি খুবই কঠিন কাজ ? আমার তো কঠিন মনে হয় না। আজকাল এমন হইয়াছে, কেহ যদি লাথি মারে তাহা হইলে তাড়াতাড়ি চারিদিক দেখিয়া লইব, আর কেহ দেখিল কিনা। কেহ যদি না দেখিয়া থাকে তো বাঁচোয়া। লাথি তো খাইতেই হইবে। শুধু সাক্ষী না থাকিলেই রক্ষা।

"ইহাও একপ্রকার জীবনদর্শন। পরাজিতের জীবনদর্শন।

"আমার বন্ধু সতীশও এইরূপ পরাজিতের জীবনদর্শনে ক্রমে বিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছিল। সেই যৌবনকালের কথা কহিতেছি। দারিদ্র্য, প্রিয়জনের মৃত্যু, সাংসারিক অশান্তিতে সে পাগলের মতো হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় সে একজন মহাপুরুষকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মন্ত্র লইয়া ফেলিল। আজ যাঁহাকে মহাপুরুষ বলিতেছি সেইদিন তাঁহাকেই ঠগ, জোচ্চোর ইত্যাদি বলিতে বাধে নাই। যাহা হউক, সতীশ দীক্ষা গ্রহণের পর সেই যে ঠাকুরের কাজ ঘাড়ে লইল আর ফিরিয়া চাহিল না। এই সে খরাপীড়িত গ্রামে টিউবওয়েল বসাইতে ছোটে, এই সে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কোন অকিঞ্চনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে, এই সে

কপর্দকশূন্য অবস্থায় যাজনে বাহির হইয়া যায়। সে এক অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া, ছন্নছাড়া জীবন। কিন্তু নিজের চোখে দেখিয়াই সব ছাড়িয়া, সর্বস্ব দিয়াও তাহার চোখে মুখে জীবনের দীপ্তি বিজুরির মতো খেলা করিত। প্রথম প্রথম বিদ্রূপ করিতাম। তারপর অনুভব করিয়াছি যে, সে যাহা পাইয়াছে, তাহা সামান্য নহে। অর্থকরী সাফল্যে তাহার বিচার হয় না।

"উহা এক বৃহৎ জীবন। ক্ষুদ্র সংসার হইতে ছুটি লইয়া বৃহৎ সংসারে মাতিয়া থাকা। স্বাভাবিক সমাজসেবীরা, পরোপকারীরা, ভ্রাম্যমানরাও বৃহৎ সংসারের খানিকটা আঁচ পায় বটে, কিন্তু সতীশ তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক কিছু পাইয়াছিল। অন্তর বাসনাশূন্য করিয়া, নিজে খালি হইয়া অপরকে ভরপুর করিবার জন্য তাহার সেই প্রাণান্ত শ্রম তাহাকে গুরু তথা ঈশ্বরের নৈকট্যে লইয়া গিয়াছিল। আজ সতীশ নাই, আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু সতীশ আগে মরিয়াও যে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছে, আমি যে সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও সেই জীবনযাপন করিতে পারিব না। অনেক পরে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, সতীশের মতো হই। কিন্তু পাকেচক্রে তাহা আর হইল না। কত বাধা আসিয়া গেল, কত বকেয়া কাজ, কত দায় ও দায়িত্ব। আজ ভাবি কী জঞ্জাল লইয়াই না জীবনটা কাটাইয়া গেলাম।"

কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল, বাবা!

কালীকিংকর সচকিত হলেন, এ বাড়িতে বড় একটা কেউ ডাকে না তাকে। জোজো আজকাল মাঝে মাঝে ডাকে। অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই। কালীকিংকর ব্যগ্রভাবে সাড়া দিলেন, কে রে? জোজো নাকি?

হ্যাঁ।

আসছি।

ডায়েরী বন্ধ করে তোশকের তলায় রাখলেন কালীকিংকর। তারপর উঠে এলেন বাইরের ঘরে।

জোজো কাত হয়ে শোয়া। চোখে কিছুটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। কথা বলছে না।

কী রে, কী হয়েছে?

আমি এইমাত্র ঘুমের মধ্যে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখলাম।

কী স্বপ্ন?

দেখলাম তুমি মরে গেছ। ভয়ে জেগে গেছি।

কালীকিংকর মায়াভরে ছেলের মাথায় একটু হাত রাখলেন। বললেন, ও কিছু না।

তুমি একটু ওই চেয়ারটায় বোসো। আমার মনটা ভাল নেই।

কালীকিংকরের আর কীই বা কাজ, তাই বসলেন। ছেলে যে এই একটু গুরুত্ব দিচ্ছে, এই তো ঢের। এইটুকুতেই আজকাল বুক ভরে যায়। মরেও বুঝি সুখ। বললেন, মন ভাল নেই কেন? কী ভাবিস অত?

আমি কি পাগল হয়ে যাবো বাবা? এতসব অর্থহীন চিন্তা কেন যে মাথায় আসে সারাদিন!

অর্থহীন চিন্তা করিস কেন? অর্থময় চিন্তা করতে পারিস না?

অর্থময় চিন্তাটা কিরকম? জানিই তো না। আচ্ছা, তোমার শরীব কেমন আছে বলো তো!

ভাল, বেশ ভাল।

কিন্তু তোমাকে আজকাল বেশ কাহিল দেখায়। অনেকদিন তোমার কোনও চেক আপ হয়নি, প্রেশার মাপা হয়নি, রক্ত পরীক্ষা হয়নি।

ওসবের কী দরকার? অসুস্থ হলে বলব, তখন করাবি।

জোজো মাথা নাড়ল, কেউ করাবে না। প্রত্যেকে এড়িয়ে যাবে।

তাতেই বা কী? চিকিৎসা হল বা না হল, বয়স তো বসে নেই। দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি। একটা না একটা উপলক্ষ ধরে যেতেই হবে।

কেন যাবে? তোমাকে ফের আমি কোথায় পাবো?

কালীকিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি তো জানি না বাবা, আমার অত জ্ঞান নেই।

বাবা, আমি একটু ঘুমোবো। কিন্তু তুমি যাবে না, বসে থাকবে। কষ্ট হবে না তো!

না, কষ্ট কিসের? তুই ঘুমো।

জোজো ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

কালীকিংকর জোজোর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

তাঁর এই ছেলেটি যদি তাঁরই ঔরসে কোনও পরস্ত্রীর গর্ভে অবৈধভাবে জন্মাতো এবং পিতাপুত্র সম্পর্ক যদি তাঁর সঙ্গে না থাকত তাহলে কি মায়া হত এত? হত না। ও আমার ছেলে, একথা জেনেও হত না।

কালীকিংকর মাথা নাড়লেন, হত না। তবে এখন কেন হয়?

জোজো ঘুমোয়নি, জেগে ছিল। বলল, কী হত না বাবা?

কালীকিংকর অপ্রস্তুত হলেন। তিনি যে মাঝে মাঝে আপনমনে কথা বলে ফেলেন তা তিনি জানেন। বললেন, ও কিছু না। বুড়ো বয়সের দোষ। যা চিন্তা করি তা অনেক সময় মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মানুষ বুড়ো হয় কেন বলো তো! মরেই বা কেন?

কালীকিংকর হাসলেন। বললেন, ওটাই প্রকৃতির নিয়ম।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই যে চারদিকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক, দুনিয়াময় যে কোটি কোটি বুড়ো বাচ্চা যুবক যুবতী, ঠিক একশ বছর পর এদের কেউ থাকবে না। কেউ না। সব নতুন মানুষ আসবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে না?

ওভাবে ভাবতে নেই। ছেলের ভিতর দিয়ে, মেয়ের ভিতর দিয়ে বাপ-মাই আবার জন্মায়। তাই সবাই মরে গেলেও আবার সবাই অন্যরকম ভাবে থেকেও যায়।

মরার পর কি সত্যিই কিছু থাকে মানুষের? কী করে থাকবে? কোথায় থাকবে?

ও কি এমনি বোঝা যায়? চোখে দেখতে পেলে, যন্ত্র দিয়ে ধরা গেলে তো মানুষের জন্মের সব রহস্যই মিটে যেত। মানুষ আর খুঁজত না, আর আকুল হত না।

তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো বাবা।

তুই এসব নিয়ে এত ভাবছিস কেন?

আমার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে আছে। অংশুদা মারা যাওয়ার পর থেকেই কেবল মৃত্যুচিন্তা আসে। অংশুদাকে রোজ স্বপ্ন দেখি। একটু আগেও দেখলাম। কী দেখলাম জানো? অংশুদা জানালার বাইরে শূন্যে ভেসে আছে। আমাকে বলল, ও ঘরে গিয়ে দেখ তোর বাবা অনেকক্ষণ হল মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম!

কথায় বলে দিবাস্বপ্ন।

আমার আর একটা কথা খুব মনে হয়, আমি সবদিক দিয়ে বড় হেরে যাচ্ছি। এত হেরে যাচ্ছি কেন বাবা?

তুই তো এত দুর্বল ছিলি না কখনো। আমি তোকে শক্তপোক্ত বলে জানতাম।

তা-ই তো ছিলাম। হঠাৎ কী যে হচ্ছে। তোমাকে এসব কথা বলার কোনো মানে হয় না, তবু দেখ কত কথা বলে যাচ্ছি।

বলবি। একজন কাউকে সব কথা বলে দিলে বুক হাল্কা হয়। ডেথ-উইশ ভাল নয়। তোর কি ধর্মে বিশ্বাস আছে?

জোজো উদাস চোখে সিলিং-এর দিকে চেয়ে বলল, কি জানি। না, বিশ্বাস থাকলে কিছু তো করতাম। দুর্গা, কালী, শিব কিছুই প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় না।

কালীকিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওটা কিছু নয়। আমার

দাদামশাই নিজে তান্ত্রিক ছিলেন, জাগ্রত কালী ছিল বাড়িতে। নিত্য পুজো হত। তবু গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন মামলায় হেরে। ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাস মানে শুধু পুজো-আর্চা তো নয়। যা মানুষকে কারণমুখী করে দেয় তাই আধ্যাত্মিকতা। মানুষ যখন পাঁতি পাঁতি করে নিজেকে খোঁজে, নিজের সোর্সকে খোঁজে, যখন পরম্পরার ভিতর দিয়ে নিজের অবস্থানকে জানার জন্য উঠে-পড়ে লাগে, তখন তার চোখের সামনে পরতে পরতে বিশ্বের রহস্য খুলে যেতে থাকে। তখন আর সে বাঁধা থাকে না। মুক্ত হয়ে যায়। যোগ ঘটে যায় বিশ্বজগতের সঙ্গে।

কোথায় পেলে এসব কথা?

আমার এক বন্ধু ছিল সতীশ। তার কাছে।

রেশন কার্ড আর ব্যাগ নিয়ে অন্বেষার নিজস্ব ঝি কমলা এসে বিরস মুখ করে কালীকিংকরকে বলল, রেশন দোকান খুলেছে। এইবেলা চলে যান।

আজই নাকি?

হ্যাঁ। গম ফুরিয়েছে। চিনি লাগবে। সাবান আনতে ভুলবেন না। দেশলাই পেলে দেশলাইও।

কমলার কথাবার্তায় বেশ কর্তৃত্বের সুর। সে জানে সে অন্বেষার নিজস্ব লোক। এ বাড়িতে কাউকে তার পরোয়া নেই।

কালীকিংকর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলেন।

জোজো শুধু জ্বলন্ত চোখে কমলার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তারও কিছু করার নেই।

কমলা সপাটে পর্দাটা সরিয়ে চলে গেল। কালীকিংকর বিনীত ভাবে রওনা হলেন। জোজো ফের একা। এক ডোজ আর্নিকা খেয়ে ফের বালিশে মাথা রাখল। বড় একা, বড় যোগাযোগহীন।

সাতদিন বিছানায় কাটল জোজোর। বাথরুম, বারান্দা আর ঘরের পরিধির মধ্যে দম বন্ধ করে, স্বপ্ন দেখে, ঘুমিয়ে, জেগে, ঘুম না জাগরণ তা না বুঝে, বই পড়ে এবং কল্পনার সুতো ছেড়ে।

সাতদিন বাদে এল জিমি।

আরে! এখনও তুমি বেড-রিডিন! নট ইয়েট ফিট?

জোজো জিমির ঝলমলে চেহারার প্রতি ঈর্ষা মেশানো চোখে চেয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, নাঃ। চিড়িক দিচ্ছে এখনও।

জিমি একটু অবাক চেয়ে থেকে বলল, তোমার বেসিক হেলথ্ চমৎকার। রিকভারিতে এত দেরী তবে হচ্ছে কেন?

কি জানি কেন!

জিমি মাথা নেড়ে বলল, একজন ফুটবলার বা ক্রিকেটারের এর চেয়েও বেশী চোট লেগে যায় হামেশা। তারা এতদিন সময় নেয় না ফিট হয়ে যেতে। হোয়াট ইজ রং উইথ ইউ? এনিথিং ব্রোকেন অর সামথিং?

ভাঙেনি, তবে বড্ড ব্যথা।

তুমি একটু উঠে দাঁড়াও তো।

জোজো উঠে দাঁড়াল।

একটু হাঁটো।

জোজো হাঁটল। বলল, ঘরের মধ্যে একটু-আধটু পারছি। কিন্তু বাইরে…

জিমি একটু শিস দিয়ে বলল, নাথিং রং। ইউ আর সাইকোলজিক্যালি সিক।

তার মানে?

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। আমি একটা ম্যাসাজ জানি। বম্বেতে শিখেছিলাম।

ওরে বাবা, ব্যথার ওপর ম্যাসাজ করলে মরে যাবো।

দেখই না। লাগলে বোলো।

জোজো শুল। এবং জিমি তার জোরালো আঙুলে পালকের মতো হাল্কা স্পর্শে ব্যথার জায়গাটায় একটা কাঁপুনি তুলল। ব্যথার জমাট ভাবটা ধীরে ধীরে যেন ছড়িয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল জোজোর।

কী, ফিট লাগছে?

জোজো উঠে বলল, অনেকটা।

আরে বাবা, তুমি ভয়ে জমে আছো। ব্যথা তোমার কবেই সেরে গেছে। হাঁটো, দৌড়োও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেখা যাক।

আরে, আজই চলো আমার সঙ্গে স্কুটারে।

পাগল নাকি?

আরে চলো তো সহী।

যাবোটা কোথায়?

কত জায়গা আছে।

জোজো অবশ্য গেল না।

মেয়েটা এল আরও দু'দিন বাদে, এক দুপুরে। এবং তাকে কিছুতেই বাস্তব বলে মনে হল না জোজোর। সে তো কতই আগড়ম-বাগড়ম স্বপ্ন দেখে সারাদিন। সেরকমই কিছু হবে।

জিমি বলল, হাই! ইউ লুক পিংক্ উইথ হেলথ্। জাম্পিং ফিট!

স্বপ্ন না সত্য তা স্থির করার আগেই জোজো জিমির দুর্দান্ত এবং ঝলমলে

চেহারাখানার দিকে ঈর্ষার চোখে পিট-পিট করে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে কাতর স্বরে বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে ? এখনও নড়লে-চড়লেই চিড়িক মারছে কোমরে।

জিমির পিছনে দাঁড়ানো মেয়েটি বড্ড স্থির, মুখ ছাইরঙা, গম্ভীর।

জোজো ধীরে-ধীরে উঠে বসল। যদি বা স্বপ্নই হয়ে থাকে তবু স্বপ্নেও তো মানুষকে ভদ্রতা লৌকিকতা করতে হয়।

জিমি হাসিমুখে বলে, পারহ্যাপস্ ইউ আর ইন লাভ উইথ দা পেইন ! এই যে, এ হল তিথি। মিট হার।

জোজো তিথিকে চিনল না। জিমির আর একজন বাঙালী গার্ল ফ্রেন্ড ? পারেও বটে ছেলেটা মেয়েমানুষ ঘাঁটাঘাঁটি করতে। সে মৃদু স্বরে বলল, বসুন।

মেয়েটা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। একটু ঘামছেও কি ? তেমন সুন্দরী কিছু নয়। খারাপও নয়। সাধারণ। তবে চোখ দু'খানা উজ্জ্বল।

মেয়েটি নীরবে বসল একটা সোফায়। রুমালে মুখ মুছল একটু।

জিমি হাসছিল। বলল, চিনতে পারোনি তিথিকে ?

জোজো মেয়েটির দিকে আর একবার চাইল। এবং মনে পড়ে গেল। তা হলে এই ছিল সেদিন জিমির স্কুটারে !

হতাশা ও বিরাগে জোজো একটু উদাস হয়ে গেল। কেন যে মেয়েছেলের জন্য এত পাগল হয় লোকে ! কী আছে ওদের মধ্যে ? খানিকটা মাংস আর কিছু নিষ্ঠুরতা দিয়ে গড়া এইসব পুতুল কি এতই মনোযোগের যোগ্য ?

তিথি মুখ নিচু করে বসে ছিল। জোজো অন্য দিকে চেয়ে বলল, চিনবার কী আছে ! সব মেয়েই একরকম।

তিথি চকিতে একবার চাইল।

জিমি নরম স্বরে বলল, তিথি সত্যিকারের গুড গার্ল।

তাই নাকি ? তা হলে তো ভালই।

হোয়াট ইজ রং জোজো ? তুমি কি তিথির ওপর রেগে আছো ?

জোজো সজোরে মাথা নেড়ে বলল, না। কখনোই না। রাগ হবে কেন ? আমি তো ওকে চিনিই না।

তিথি উঠে দাঁড়াল। তার মুখে থমথম করছে কান্না। একটু ধরা-ধরা গলায় বলল, আমি যাচ্ছি জিমি। আই অ্যাম ফিলিং ইনসাল্টেড।

জিমি শশব্যস্তে বলল, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটা কিছু ভুল হচ্ছে। তুমি ভাল মেয়ে, জোজো ভাল ছেলে, দেন হোয়াট ইজ রং ইন বিটউইন ?

জোজোর মনে হচ্ছিল, একটু বেশীই অভদ্রতা হয়ে গেছে। মেয়েটা তেমন কিছু দোষ করেনি। যা করেছিল তা নিতান্তই জৈব নিরাপত্তাবোধ থেকে, ভয়

থেকে। তার বাড়িতে যখন এসেছে তখন....

জোজো তিথির দিকে চেয়ে বলল, শুনুন, আমার মনটা ভাল নেই। নানা গণ্ডগোলে আছি। অনেক সময়ে উল্টোপাল্টা কী সব বলে ফেলি। ডোন্ট মাইন্ড।

তিথি একটু ভেজা গলায় বলল, আপনি জিমির কাছেও অনেক কথা বলেছেন, ওকে আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছেন।

করেছি। কারণ মেয়েদের সম্পর্কে আমার ধারণাটা একটা ঘটনায় বড় চোট খেয়ে গেছে। তবে ভেবে দেখেছি, সেদিন আপনার তেমন দোষ ছিল না।

শুধু তাই নয়। আমি সেই ঘটনার পর ভাল করে ঘুমোতে পারিনি, খেতে পারিনি। আমি তো ক্রুয়েল নই।

জোজো সত্যিকারের হতাশ-মিয়েনো গলায় বলল, আমার যে কী হয়েছে তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সবাই বলে আমি উইমেন-হেটার হয়ে যাচ্ছি। যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে সেটাও একটা অসুখ। এই অসুখের কোনও চিকিৎসা আছে, জানেন?

প্রথম আলাপেই যে কেউ এরকম সব উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারে তা তিথির জানা ছিল না। ছেলেটা পাগল-টাগল নয়তো? তিথি কিছুক্ষণ সন্দিহান চোখে চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, অসুখ হবে কেন? আমরা অনেকেই তো ম্যান-হেটার।

জোজো মাথা নেড়ে বলল, জানি। নারীমুক্তি আন্দোলন যারা করে তাদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রবল। আর সেটাও অসুখ।

কোনওটাই অসুখ নয়।

জোজো তিথির দিকে অসহায় চোখে চেয়ে থেকে বলল, আজকাল অনেক অসুখ যে প্রগতি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার বকলমে চলে যায়। হোমোসেকসুয়ালিটি, লেসবিয়ানিজম, ভায়োলেনস, অহমিকা, অন্যকে ঘেন্না। অসুখ নয় বলছেন? ভীষণ অসুখ। পৃথিবীর গভীর, গভীরতর....আরে, আপনি বসুন না। জমিয়ে ঝগড়া করা যাক। আমার সময়টা যে সারাদিন কীভাবে কাটে।

তিথি মুখ গোঁজ করে বসে ঘড়ি দেখে বলল, শেষ ক্লাসটা জিওগ্রাফির। ওটা করতেই হবে। আর চল্লিশ মিনিট বাকি।

জোজো হতাশ গলায় বলল, সময় মাপলে আর ঝগড়া করে কী হবে? এ তো ডিবেট নয়, রীতিমত মৌলিক প্রশ্নের লড়াই।

জিমি একটু অবাক হয়ে তিথির দিকে চেয়ে বলল, ইউ আর ইন লাভ উইথ জিওগ্রাফি। রোজ তুমি এই একটা ক্লাসের কথা বলো।

তিথি একটু লাজুক মুখে বলল, জিওগ্রাফি আমার ভীষণ ভাল লাগে যে।

জোজো বলে, কেন লাগে ?

জিওগ্রাফি পড়তে-পড়তে আমি মনে-মনে কত জায়গায় চলে যাই, জীবনে কখনও যেসব জায়গায় যাওয়া হবে না। পাসপোর্ট নেই, ভিসা নেই, ভাড়া লাগে না। খুব বেড়িয়ে নিই মনের সুখে।

সামান্য হাসল জিমি আর জোজো।

জিমি বলল, বিদেশে যেতে চাও তো ! যাবে। কত ওপেনিং আছে। আমেরিকা যাওয়া তো ভেরী ইজি। গাদা-গাদা স্কলারশিপ আছে। গিয়ে সেটল্ করে নিলেই হল।

তিথি মাথা নেড়ে বলল, বাঃ রে। শুধু আমেরিকা কেন ? লোকে বিদেশ বলতেই আজকাল শুধু ইউরোপ আমেরিকা বোঝে। ওসব দেশ নয় শুধু। আমার তো আফ্রিকাতেও যেতে ইচ্ছে করে, তিব্বতে যেতে ইচ্ছে করে, হাইতি যেতে ইচ্ছে করে। সারা পৃথিবী বনবন করে ঘুরে বেড়াব, কোনও একটা সুখের জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকব না।

জোজো মৃদু-মৃদু হাসছিল। বলল, তা হলে জিওগ্রাফি ক্লাসটা আপনার মিস করা উচিত নয়।

না। জিওগ্রাফি আমার ভীষণ প্রিয় সাবজেক্ট। আর যে প্রফেসর আমাদের জিওগ্রাফি পড়ান তিনিও জিওগ্রাফি-ড্রাংক। পাগলের মতো পড়ান, ভীষণ প্যাশন দিয়ে। চোখের সামনে সব ভেসে ওঠে।

আপনি ভাগ্যবতী।

কেন ?

আপনার তবু প্রিয় একটি বিষয় আছে। আমার নেই। আমার কোনও প্রিয় বিষয় নেই।

জিমি বলে, তোমারও প্রিয় একটা বিষয় আছে জোজো। পলিটিকস্। বাঙালী মাত্রই পলিটিকস্ ভালবাসে।

আমি এখন পলিটিকস্ ঘেন্না করি।

তা হলে বলব ? তোমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে টু স্টে সিক।

ধাক্কাটা তো তুমিই দিয়েছিলে বাপ, কতটা চোট হয়েছিল তা কি বুঝতে পারোনি ?

খুব চোট হয়েছিল ঠিক ! কিন্তু দশদিন কেটে গেছে জোজো। তোমার শরীরে আর ব্যথা নেই, যা আছে তা হল মেমারি অফ এ পেইন, নট দা রিয়াল পেইন। মেমারি ইজ এ স্ট্রেঞ্জ থিং জোজো, ইট প্লেজ ট্রিকস্।

ওঃ, তাই যদি হত !

আমি আমাদের নতুন মারুতি গাড়িটা আজ নিয়ে এসেছি জোজো। চল বাইরেটা একটু দেখে আসবে।

না, থাক !

ঘরে পড়ে থেকে তুমি সারাদিন ব্রুড করতে ভালবাসো। কী এত ভাবো জোজো ?

কি ভাবি তার কি কোনও ঠিক আছে ? সবচেয়ে বেশী ভাবি মৃত্যুর কথা।

দ্যাট ইজ ডেনজারাস।

হ্যাঁ, খুবই ডেনজারাস। একবার আমি সুইসাইড করতে গিয়েছিলাম।

কেন ? ইজ দেয়ার এ স্টোরি ?

জোজো হাসল, হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমার মনে হয় দেয়ার আর সেভারেল স্টোরিজ টু প্রোভোক মি ইন অ্যাটেম্পটিং অ্যানাদার সুইসাইড। দা ফাইন্যাল ওয়ান।

জোজো, আমার কখনও কিন্তু মরতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, আমি ইচ্ছে করলে দুশো তিনশো বছর বেঁচে থাকতে পারি।

তুমি ভাগ্যবান। একবার যদি মৃত্যুর ভাবনা পেয়ে বসে তবে আর কিছুতেই তা ছাড়ানো যায় না, দেখো।

সারাদিন তুমি সুইসাইডের চিন্তা করো ? তা হলে তো তোমাকে ঘর থেকে টেনে বের করতেই হয়। চলো। গেট আপ।

লীভ মি জিমি।

কেন ?

একদিন যদি তোমার মারুতি গাড়িতে চড়ি তা হলে আমার সুইসাইডের ইচ্ছে আরও বেড়ে যাবে। জানো না তো, আমি কী ভীষণ ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকসে ভুগি। আমাদের গাড়ি নেই, জীবনেও হবে না। আমি কী চাকরি করি জানো ? একটা ছোট্টো ফার্মের অড জব ম্যান। টাইপ করি, অ্যাকাউন্ট রাখি, কোম্পানির বেয়ারা হয়ে এ অফিস সে অফিসে চিঠিপত্র পৌঁছে দিই, অর্ডার নিয়ে আসি। মাইনে পাই....

প্লীজ স্টপ। তিথির সামনে নয়।

ওঃ, ওর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

তিথি ম্লান একটু হাসল। বলল, আপনার কী হয়েছে বলুন তো ? কেন এত মেজাজ খারাপ ?

সব শুনবেন ? তা হলে তো জিওগ্রাফি ক্লাসটা মিস করতে হয়।

সংক্ষেপে।

একটা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল। মেয়েটা বিয়ে করেছে। তারপর থেকেই সব তালগোল পাকিয়ে গেল। মরতে গিয়েছিলাম, হয়ে উঠল না। এই সেদিন আমাদের একজন লিডার মারা গেলেন। মনটা এত দুর্বল হয়ে গেল যে শ্মশান অবধি যেতে পারলাম না। সেইদিন এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, বোকার মতো অ্যাকসিডেন্ট করে বসলাম। কেন অন্যমনস্ক, কী যে সারাদিন ভাবি তা-ই ভেবে পাই না। খেই হারিয়ে ফেলি। কিন্তু খেয়াল করলে দেখি যে, সারাদিন আমি কেবল মৃত্যুর কথা ভাবি। নিজের, অন্যের। কী হয় জানেন ? কেউ মারা গেছে খবর পেলেই বুকটা ধক করে ওঠে, ওর সঙ্গে আর কখনও....কখনও দেখা হবে না ? যে-কোনও মানুষের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, আহা, এও তো একদিন মরে যাবে। যে-কোনও শিশুর দিকে তাকালে মনে হয়, এও তো একদিন বুড়ো হয়ে যাবে, মরবে। যারা জন্মেছে, যারা জন্মাবে তাদের সকলের জন্য কষ্ট হতে থাকে। সকলেই মরে যাবে। তা হলে কেন এই জন্ম, কেন এত জল ঘোলা করা বলুন তো!

দু'জনের কেউ কোনও কথা বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

জোজো তিথির দিকে উদাস চোখে চেয়ে স্বপ্নে-দেখা একটা দৃশ্যের ধারাবিবরণী দেওয়ার মতো গলায় বলল, আর কী ইচ্ছে হয় শুনবেন ? ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে একটা নদীর ধারে গিয়ে ঘর বেঁধে থাকি। পিছনে ছোট্ট একটু হাট, সামান্য কিছু লোকজনের আনাগোনা। সরল, নিরীহ, গ্রাম্য কিছু মানুষজন। ধর্মভীরু, সত্যবাদী, দয়ালু। সামনে একটা ছলছলে ঢেউওলা নদী। একটা ডিঙি নৌকো বাঁধা থাকবে ঘাটে। সারাদিন চেয়ে দেখব নৌকোর পারাপার। আকাশে কখনও রোদ্দুর, কখনও মেঘ....কিন্তু আপনার ক্লাসের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

যাই।

তিথি উঠল।

জিমি একটু ঝুঁকে জোজোর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, মাঝখানে জাস্ট দু'দিনের জন্য দিল্লি গিয়েছিলাম। পিতাজী রাজি হয়েছেন। আমি টিভির জন্য সিরিয়াল তুলবার স্টুডিও করছি।

কোথায় ?

বোম্বে। আমার কলকাতায় ইচ্ছে ছিল। পিতাজী বলল, বোম্বে।

জোজো চোখ দুটো বুজে একটু শক্ত হয়ে রইল। তারপর বলল, তোমার সাকসেস স্টোরি আমি শুনতে চাই না জিমি। আই অ্যাম জেলাস।

নটি বয়, ইউ আর নট দ্যাট ব্যাড।

আই অ্যাম ব্যাড। ভেরি ব্যাড। একদিন বুঝবে।

* * *

মরকুটে ঘাস। পেচ্ছাপের গন্ধ। রোগা নাতি। ধোঁয়াটে বিকেল।

কিন্তু আজ একটা চমক অপেক্ষা করছিল কালীকিংকরের জন্য। এত চমকাননি বহুকাল।

বেঞ্চটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। একেবারে মুখ থুবড়ে।

অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন কালীকিংকর। ঢকঢক করে নড়ত। রংচটা, ভাঙা। তবু খাড়া ছিল এতদিন। যেমন তিনি। হঠাৎ কী হল?

দুষ্টু ছেলেদেরই কাজ। তাদেরই বা দোষ কী? এই পার্কে একসময়ে স্লিপ ছিল, দোলনা ছিল, ঝুল খাওয়ার সরঞ্জাম ছিল। ভাঙতে-ভাঙতে, চুরি হতে-হতে এখন আব কিছু নেই। বাগান ছিল। এখন ঘাসই খুঁজে পাওয়া দায়। দামাল ছেলেরা খেলার কিছু না পেয়ে বেঞ্চ-এ ওঠে, লাফায়। নড়ন্ত দেখে তারাই বাকী কাজটুকু সেরে দিয়ে গেছে। কালীকিংকর জানেন, এ আর মেরামত হবে না। এমনি উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে কিছুদিন। চুরি যাবে হয়তো। না হলে আরও ভাঙবে। তারপর নেই হয়ে যাবে।

এখন কোথায় বসে ঝিমোবেন কালীকিংকর?

গোপুও খুব দুঃখের সঙ্গে স্থির দৃষ্টিতে দাদুর বেঞ্চখানার দুর্দশা দেখছিল। তারপর বলল, দাদু, ভেঙে গেছে?

হ্যাঁ ভাই, আমার বসার পাট উঠল।

গোপু খুব সাবধানে বেঞ্চটাকে একটু ছুঁয়ে বলে উঠল, এ মা, একদম ভেঙে গেছে। তুমি তা হলে কোথায় বসবে দাদু?

এতই নিরাশ্রয় এবং অসহায় বোধ করলেন কালীকিংকর যে, তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। যেন পার্কের কোণায় এই বেঞ্চখানাই পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। পেচ্ছাপের কটু গন্ধ আর বেঞ্চখানার অবিরল নড়া সত্ত্বেও কালীকিংকর এইখানটাতে সবচেয়ে বেশী ফিরে পান নিজেকে। কিছুক্ষণ তিনি বিহ্বল চোখে দৃশ্যটা দেখলেন।

বাচ্চা গোপুও বোধহয় দাদুর শোক টের পেল। সে মুখ তুলে বলল, তুলি দাদু?

কালীকিংকর অন্যমনস্ক ছিলেন, কিছু বললেন না।

গোপু তার রোগা দুর্বল হাতে বেঞ্চখানা টানতে লাগল, হেঁইও! হেঁইও!

থাক ভাই। ও আর দাঁড়াবে না। তোমার আবার লেগে-টেগে যাবে।

গোপু করুণ গলায় বলে, তুমি তা হলে কোথায় বসবে দাদু ?

বসব কোথাও।

তুলি না দাদু ?

তুমি পারবে না। ভীষণ ভারী। আর তুললেই ফের পড়ে যাবে।

গোপু শুনল না। আরও কয়েকবার 'হেঁইও হেঁইও' করে টান দিয়ে এসে াদুর হাত ধরে বলল, চল না দাদু তুলি।

তুমি ভাই, বোগাও যেমন জেদীও তেমন। আমি কি এই বুড়োবয়সে পারি ওই ভারী জিনিস তুলতে ?

এসো না দাদু !

অগত্যা কালীকিংকর ছেলে-ভুলোনোর মতো করে বেঞ্চটা ধরে একটু টানাটানি করলেন। সঙ্গে গোপুও। বেঞ্চটা যেমনকে তেমন পড়েই রইল।

কালীকিংকর বললেন, হয়েছে তো !

গোপু গম্ভীর হয়ে বলল, ও শুয়ে আছে কেন ?

মাজার জোর নেই ভাই।

আর একটু টানো না !

জ্বালালে।

কালীকিংকর নিচু হলেন। এবং হঠাৎ তাঁর মনে হল, বেঞ্চটা যেন একটা াতর শব্দ করল। যেন বলল, ওঃ !

কালীকিংকর থমকে গেলেন। বুড়োবয়সে কত কী মাথায় আসে। তবু তাঁর নে হল, বেঞ্চটা উঠে সোজা হতে চাইছে। রোজকার মতো তাঁকে কোলে নিতে ইছে। পারছে না। তাঁর আর একটু চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু পারবেন কি ?

কালীকিংকর শক্ত হাতে বেঞ্চটার কানা ধরলেন, তারপর গোপুর দিকে চেয়ে লেন, মারো টান, হেঁইও !

হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও।

বেঞ্চটা খুব ধীরে-ধীরে জগদ্দল ভার নিয়ে উঠতে লাগল। খুবই শ্রম হচ্ছিল লীকিংকরের। তবু একটা আনন্দও হচ্ছিল। যদি দাঁড়ায় তো একটা যুদ্ধে জিত । বহুকাল জেতেননি কালীকিংকর।

ঘপাৎ করে একসময়ে বেঞ্চটা সটান হয়ে খাপে-খাপে বসে গেল। শানের ে গাঁথা দুটো পেল্লায় স্ক্রু বেঞ্চের পায়ার দুটো ছিদ্রের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু আটকাবে কিসে ? কালীকিংকর নিচু হয়ে খুঁজতে লাগলেন এবং াকাছিই পেয়ে গেলেন দুটো নাট।

গোপু কখনও কোনও উল্লাস প্রকাশ করে না, বড় একটা হাসে না। এখন কিন্তু গাল ভরে হাসছিল। উবু হয়ে বসা কালীকিংকরের পিঠের ওপর উপুড় হয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার বেঞ্চ ঠিক হয়ে গেছে না দাদু ? এখন বসতে পারবে, না ?

কালীকিংকর নাতিকে একটু আদর করলেন, হ্যাঁ ভাই, তোমার জন্যই হল। শুধু তোমার জন্যই।

আমার গায়ে খুব জোর, না দাদু ?

তা তো বটেই।

কালীকিংকর আবার তাঁর বেঞ্চখানায় বসলেন। বেঞ্চ ঢক করে নড়ে তাঁকে স্বাগত জানায়। নাটদুটো কেউ একটু টাইট মেরে দিলে বেঞ্চখানার ঢকঢকানিও বন্ধ হয়ে যেত। কালীকিংকর স্থির করলেন, কাল পাড়ার কলের মিস্ত্রি শিবুচরণের কাছ থেকে রেঞ্চখানা ধার করে আনবেন।

গোপু আজ 'বু বু' শব্দ করে দৌড়াচ্ছে। ঘুরে-ঘুরে। বোধহয় উড়ন্ত কোনও পালক, আঁশ বা পোকার পিছনে। দুর্বল পা। দৌড়ে-দৌড়ে যদি সবল হয় তবে ছেলেটার রোখ দেখে আজ বড় খুশি কালীকিংকর। রোখ থাকা ভাল। যদি ভালর দিকে রোখটা চাড়ায় তবে ধাঁ করে উন্নতি করে ফেলবে।

ভাবতে-ভাবতে কালীকিংকর রোজকার মতো ঝিমুনিতে ঢুলতে লাগলেন।

বাড়ি ফেরবার সময় আজ একটা ঘটনা ঘটল। খুব বড় ধরনের ঘটনা নয়, কিন্তু ছোটো হলেও ঘটনাটা কেমন বিঁধে রইল বুকে কাঁটা হয়ে।

বাড়ির গলিটার মুখে পড়ার একটু আগে হঠাৎ গোপু বলে উঠল, দাদু, ওই দেখ মা।

কালীকিংকরের বুড়ো চোখের দৃষ্টি তেমন প্রাঞ্জল নয়। একটু তটস্থ হয়ে বললেন, কই, কোথায় ?

ওই দেখ না, স্কুটার থেকে নামছে।

স্কুটার ! দূর বোকা !

ওই তো !

কালীকিংকর দেখতে পেলেন। অন্বেষা স্কুটারের পিছনের সীট থেকে সদ্য নেমে স্কুটারওলার সঙ্গে দু-একটা কথা বলছে।

কালীকিংকর সভয়ে নাতির হাত চেপে ধরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভাই, একটু বেঁধে। তোমার মা ভিতরে চলে যাক।

গোপু শব্দও করল না। স্থির দাঁড়িয়ে রইল তাঁর গা ঘেঁষে।

বউমা স্কুটারে ফিরছে, এটা ভারী নতুন ঘটনা। কার স্কুটার ? লোকটা কে ?

এসব প্রশ্নের জবাব অবশ্য কালীকিংকর কোনওদিনই পাবেন না। তবে কাঁটাটা খচ-খচ করতে লাগল। বিমলের সঙ্গে বউমার সম্পর্ক তো ভাল নয়। বোধহয় শোয়া-বসাও তেমন নেই। ওদের ঘরে যে-সব চেঁচামেচি হয় তা আঁড়ি পেতে শোনার দরকার হয় না। আপনিই কানে আসে। সেসব কথা মোটেই ভাল কথা নয়।

আজ রাতে বিমল স্পষ্ট বুঝতে পারল অন্বেষা তৃপ্ত।

জিজ্ঞেস করতে তার সাহস হল না। কিন্তু অন্বেষা যখন শোওয়ার আগে ক্রিম মাখছিল মুখে তখন সে নিত্য-পাঠ্য সেকস্ ম্যাগাজিন থেকে চুরি করে চোখ তুলে দেখছিল। সে তেমন অভিজ্ঞ নয় বটে, কিন্তু তবু মনে হল, অন্বেষার শরীরের শান্তি তার মুখেও ছড়িয়ে পড়েছে। একটু চোরা হাসি আছে মুখে। চোখে দুষ্টু চাউনি।

বিমল ম্যাগাজিন রেখে পাশ ফিরে শুল। ঘুমের ভান করে জেগে রইল গভীর রাত অবধি।

জিমি ও জনি, তিথি ও পূর্বা, বিজয় ও বিষাদ

বোম্বের সমুদ্রের ধারে দুই ভাই ছেলেবেলায় বল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে খেলত। 'ক্যাচ ইট' বলে একজন ছুঁড়ে দিত, অন্যজন ধরত। আবার সে 'ক্যাচ ইট' বলে ছুঁড়ে দিত।

সেই খেলাটা খুব মনে আছে জিমির।

কাপড়ের দোকানটা এখন রমরম করে চলছে। জলি প্যাটেল তাতে খুশি নয়। মাঝে-মাঝেই দিল্লি থেকে এসে বলে যায়, এক্সপ্যান্ড, এক্সপ্যান্ড। ক্যাপিট্যাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। এটা বায়ারস্ মার্কেট, বসে থাকলে চলবে না।

সেই ক্যাপিট্যাল নিয়ে জনি ঝাঁপিয়ে পড়ল ইলেকট্রনিক্স গুডস্-এ। মৌলালির কাছে লাখ টাকা খরচ করে বড় দোকান সাজিয়ে ফেলেছে। টিভি, মিক্সি, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র থরে-থরে সাজানো। দুটো দোকানে সারাদিন মাকু মারতে হয় তাকে। সময় নেই, বিশ্রাম নেই। তবু জিমিকে কখনও বলে না, তুই ওটা দেখ কি এটা সামাল দে।

জনি জানে, জিমির ক্যারিয়ার হবে অন্য রকম। অনেক মহান। সে একদিন বোম্বের হীরো হবে। এক ডাকে চিনবে সবাই। সেদিন জনির বুক ফুলে উঠবে

অহংকারে।

বাপ জলি প্যাটেল টাকা ঢালতে রাজি হয়েছে। জিমি বোম্বে যাচ্ছে টিভির জন্য অ্যাড ফিলম্ আর সিরিয়ালের স্টুডিও বানাতে। লাখ লাখ টাকা খরচ।

জিমি জনিকে ভালবাসে পাগলের মতো। যদিও দুই ভাইয়ে দেখা-সাক্ষাৎ হয় কমই। শুধু ব্রেকফাস্টের সময় ছাড়া তারা মুখোমুখি হয় না। তবে জিমি টের পায়, আজকাল জনি বাড়ি ফেরে একা। সঙ্গে কোনও ভাড়াটে মেয়েছেলেও থাকে না। এত টায়ার্ড থাকে, সময়ও এত কম এবং দু-দুটো দোকান নিয়ে উদ্বেগ এত বেশী যে ওসব এখন মাথাতেই আসে না জনির। সে ফিরে এসে আধ ঘণ্টা ধরে দেদার হুইস্কি খায়। মড়ার মতো ঘুমোয়। সকালে অ্যালার্ম শুনে যন্ত্রের মতো উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বেরিয়ে পড়ে। জনির বিয়ের কথা চলছে দিল্লিতে। বাস্তবিক ওর বিয়েটা দরকার। জনি অসম্ভব সেক্‌সি। হট টাইপ। সেই জনি এখন কাজের চাকায় পেষাই হয়ে যাচ্ছে।

বেচারা জনি।

এরকমই যখন অবস্থা তখন জিমি একটা টেলিফোন পেল। সকালে।

আমি অন্বেষা। আমাকে মনে আছে?

মোট তিন সেকেন্ড সময় নিল মনে করতে জিমি। তার স্মৃতি অনেকটা ফোটোগ্রাফির মতো।

হ্যাল্লো! আপনি তো জোজোর বউদি।

ঠিক। কিন্তু তোমার বউদি নই, মনে রেখো।

জিমি আর মাত্র দু' সেকেন্ড সময় নিল গলার কাঁপনটা বুঝে নিতে। বলল, ইটস্ অলরাইট। ইউ আর অন্বেষা টু মি। আপনি তো সেলস্ ট্যাকসে আছেন।

হ্যাঁ। বাব্বাঃ, খুব মেমরি তো!

খুব। দ্যাট ইজ মাই অ্যাসেট।

শোনো, তোমাদের ক'টা দোকান যেন!

দুটো। কাপড়ের আর ইলেকট্রনিক্স-এর।

ঠিকানা বলবে?

লিখে নিন।...

শোনো। আজ লাঞ্চ আওয়ারে আমার অফিসে এসো। কাজ আছে।

নিশ্চয়ই। শোনো অন্বেষা, গত সপ্তাহে আমাদের একটা দোকানে রেইড হয়েছে। *আমার মনে হয় রেইড করিয়েছো তুমি, নটি গার্ল।*

অন্বেষা খুব হাসছিল। বলল, কী করে বুঝলে?

সব জানি। টেলিফোনটা অনেক আগে করতে পারতে। আই নো হোয়াট দি

উইমেন ওয়াণ্ট ফ্রম মি।

খুব পাকা হয়েছো। লাঞ্চে এসো, মজা বোঝাবো।

আমার কাছে দুনিয়াটাই মজা। দুনিয়াভর মজা। লাইফ ইজ ফুল অফ ফানস্। লাঞ্চে যাচ্ছি। বাই।

বাই।

ফোন রেখে জিমি তড়িৎ হাতে তার নোটবই খুলল। কী বোকা সে! কী বোকা! জোজোর বউদি অন্বেষা চক্রবর্তীর নামের পাশে পরিষ্কার লেখা আছে সেলস্ ট্যাক্স অফিসার, তবু সে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কী করে ভুলে গিয়েছিল! আজ অন্বেষার ফোন পেয়েই হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল রেইড-এর কথা। সেই সঙ্গে দুইয়ে দুইয়ে চার।

গত সপ্তাহে রেইডটা হয়েছিল আচমকা এবং শুধু তাদের দোকানেই। বিস্তর খাতাপত্র আটক হয়েছে। অনেক টাকা ফাইনও হওয়ার কথা। জনির মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। আশ্চর্য, তখন একবারও অন্বেষার কথা মনে পড়েনি তো! জিমির কি তবে রিফ্লেক্স কমে যাচ্ছে? মেমারি প্লেয়িং ট্রিক্স?

সে দৌড়ে গেল জনির ঘরে।

জনি! জনি!

জনি বাথরুম থেকে সাবান মাখানো মুখ বের করে উঁকি দিয়ে বলল, কী?

প্রবলেম সলভড্।

কিসের প্রবলেম?

সেলস্ ট্যাক্স।

ভ্রূ কুঁচকে জনি বলে, কিরকম?

আমার এক বন্ধুর বউদি সেলস্ ট্যাক্স অফিসার, রেইড সে করিয়েছে।

হোয়াট ফর?

ইউ নো।

জনি একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে হঠাৎ উদ্ভাসিত মুখে হাসল। বলল, ইউ রাসক্যাল।

আজ লাঞ্চে ডেকেছে।

গো অ্যাহেড।

জিমি নিজের ঘরে ফিরে এসে স্টিরিও চালাল। বিলায়েতের লং প্লেয়িং। টোরি। তার নার্ভের ওপর চমৎকার কাজ করে এই বাজনাটা।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গেই জিমি তার ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ সেরে নিচ্ছিল। এরকম করে করলে কোনও ক্লান্তি আসে না।

যখন আয়নার সামনে শর্টস পরা ঈষৎ ঘর্মাক্ত শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাইল জিমি, তখন তার শরীরের প্রত্যেকটা পেশী জাগ্রত। চমৎকার আঁট ও চ্যাপটা পেশী, কে যেন দুরমুশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে বসিয়ে রিপিট এঁটে দিয়েছে শরীরে।

তার এই শরীর মেয়েরা চায়।

খুব ছেলেবেলা থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল জিমির। প্রথম একজন কাজিন। তারপর এক স্কুল মিস্ট্রেস। তারপর থেকে কে নয়? এমন কি হোমো-সেকসুয়ালরাও ধরেছে জিমিকে। বোম্বে থেকে দিল্লি অবধি জিমির আর ছুটি ছিল না। তখন সেও যাকে পেত তাকেই নিয়ে নিত। বাছবিচার ছিল না।

খুব অল্প বয়স থেকে শুরু করার ফলেই বোধহয় জিমি এখন ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত। সত্য বটে, এখনও সে মেয়েদের সঙ্গে শরীর লেনদেন করে, তবে খুব বেছে, নিতান্ত যা না হলে নয়। শুধু বাছাই দু-একজন। বয়স্কা সেক্স-স্টার্ভ্ড মহিলাদের ক্ষুধার শিকার হওয়ার স্টেজ জিমির অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। অন্বেষাকে তাই সে পাত্তা দেয়নি। দেওয়া উচিত ছিল। সেলস্ ট্যাক্স অফিসার কথাটা তার কানে ঢুকেও মগজে গাঁথেনি।

দুপুরে অন্বেষার অফিসে গিয়ে জিমি দেখল, অন্বেষা ভীষণ গম্ভীর থাকার চেষ্টা করছে।

ট্রায়িং টু ইমপ্রেস? মুখোশটা খুলে ফেল অনু।

যাঃ, খুব ইয়ার্কি শিখেছো। চলো কোথায় যাবে।

জায়গা ঠিক করা আছে। নিচে মারুতি ওয়েটিং।

কিন্তু নেমন্তন্ন তো আমি করেছি।

আরে, ইটস্ অল দি হাউজ টু ডে।

তার মানে কি?

আজ আমরা খাওয়াবো। জনি টেবিল বুক করে রেখেছে। স্কাইরুম।

গাড়িতেও অন্বেষা থমথমে মুখে বসেছিল। বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। জিমি বুঝে নিল। মেয়েটার এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার। বেশি ঘাঁটাল না জিমি। ওকে ওর মতো থাকতে দিল।

জনি অপেক্ষা করছিল। জিমির মতো জনি ফুটফুটে সুন্দর নয় ঠিকই। তবে তার চেহারায় একটা বন্য রম্যতা আছে। আছে কাঁচা ও আদিম একটা অনুষঙ্গ। জিমির চেয়ে সে এক ইঞ্চি বেশি লম্বা, অনেক বেশী চওড়া কবজি ও বুক, টাটা বিল্ডিংসের মতো শক্ত ও পোক্ত কাঠামো। এক অতীব উত্তেজক পুরুষ, কামুকা

ও দ্বিচারিণীদের পক্ষে।

জিমি জানত অন্বেষার জন্য জনিই প্রশস্ত। জনিরও দরকার। বেচারা সময় পায় না, খেটে হেদিয়ে মরছে। প্রচণ্ড টেনশন। একটু তো এন্টারটেনমেন্ট লাগে মানুষের। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

মিট জনি অন্বেষা। মাই বিগ ব্রাদার।

অন্বেষা তপ্ত হয়ে উঠল। কুঁকড়ে গেল। কেমন যেন হতে লাগল তার মধ্যে।

ষাট টাকার চিংড়ি, আশি টাকার মুর্গী এবং এরকম সব দামী খাবারের অর্ডার গেল।

জিমি আস্তে করে অন্বেষার কানে কানে বলল, ড্রিংকস্?

আমার অভ্যাস নেই। না।

একটু হোক। ফর দা নার্ভ্‌স।

কখনও খাইনি যে।

ইট উইল নট কিল ইউ। হার্ড ড্রিংকস্ নয়। ওয়াইন।

মাথা ঘুরবে না তো!

না।

জনি হাত বাড়িয়ে অন্বেষার একখানা হাত চেপে ধরে বলল, ডোন্ট ওরি।

অন্বেষা এমন কেঁপে উঠল!

জিমি লক্ষণগুলো জানে। বেচারা।

ওয়াইনটা খেতে আর কোনও বাধা হল না অন্বেষার। তারপর ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে মুখে রক্তাভা ফুটল। অন্বেষা হাসতে লাগল। কথা শুরু করল।

জিমি ক্লান্ত চোখে দেখল। নিশ্চিন্ত হল।

একটা চিংড়ি শেষ করে উঠে পড়ল জিমি। বলল, আমি যাচ্ছি।

অন্বেষা অবাক হয়ে বলল, কোথায়?

টু ইজ কমপ্যানি, থ্রি ইজ ক্রাউড, ইউ নো। আমার কাজ আছে। জনি উইল টেক ইউ হোম।

অন্বেষা যে আপত্তি করবে না তা জানত জিমি। সেক্স যাদের কুরে কুরে খাচ্ছে তাদের বাছাবাছি থাকে না। বরং জনিকে দেখে জিমিকে তাদের রেহাই দেওয়ারই কথা।

অন্বেষাও দিল।

আজ ভারী আনন্দ হচ্ছিল জিমির। বিয়ের আগে জনিটা খেটে খেটে শুকিয়ে যাচ্ছিল। খাটুনি, উদ্বেগ, অশান্তি। আজ জনি কিছু ঠাণ্ডা হবে। হয়তো এখন

থেকে প্রায়ই হবে।

বাই জনি।

বাই।

বাই অন্বেষা।

বাই।

জনির স্কুটারের চাবিটা নিয়ে উঠে পড়ল জিমি। মারুতি ওদের জন্য রইল।

★ ★ ★

এই তিথি, জিমির কী খবর রে ? পরশু আমার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। এল না তো !

তিথি কলেজের মাঠে রোদে পিঠ দিয়ে অফ পিরয়িড কাটাচ্ছিল। কোলে একখানা উপন্যাস। জবাব দিল না।

রত্না ফের বলল, এই তিথি ! বই কেড়ে নেবো কিন্তু।

আমি কি জিমির প্রাইভেট সেক্রেটারি ?

আহা রে, সব জানি। তোদের বাড়িতে তো যায়।

ওর ফোন নম্বর তো জানিস। ফোন কর না।

করিনি নাকি ?

কী বলল ?

অন্য একজন ধরেছিল। কেমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলা। মনে হল হাঁফাচ্ছে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল, জিমি ইজ আউট। প্লীজ ডোন্ট ডিস্টার্ব। বলেই রেখে দিল ঘড়াম করে। কী ছোটোলোক। কে রে লোকটা ?

কে জানে !

তুই সব জানিস। বল না বাবা কোথায় গেছে জিমি।

বয়ে গেছে জানতে।

আর ইউ জেলাস ? শোন অমন রাগ করিস না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল রোটারি ক্লাবে ওকে ইনট্রোডিউস করার। বাবাকে বলেও রেখেছিলাম।

তিথি বই বন্ধ করে বলল, জিমি বম্বে গেছে। কাল বা পরশু ফিরবে

দেখেছো কাণ্ড ! কী হবে এখন ?

তিথি একা করিডোর ধরে হেঁটে হেঁটে ক্লাসঘরে এল। না, আজও ক্লাস হবে না। প্রফেসার আসেননি।

তিথি বেরিয়ে বাস ধরল। মন ভাল নেই। সেই ছেলেটা কি পাগল ? না কি ইচ্ছে করে অপমান করেছিল তাকে ? ওরকম মৃত্যু মৃত্যু করে হেদিয়ে মরে নাকি

কোনও যুবক ? কোনও মানে হয় ?

তিথি বাড়ি ফিরে এল। লেটার বক্সে বাবার নামে একটা চিঠি। ঘরে ঢুকল। এসময়ে ঝি ছাড়া কেউ থাকে না। চিঠিটা নাড়াচাড়া করল তিথি। একটা পত্রিকার অফিস থেকে এসেছে। দিদির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কাগজে।

সে খুলল চিঠিটা।

বক্স নং ৩১৬

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত রবিবার 'পাত্র চাই বিভাগে আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে এই পত্র দিতেছি। পাত্র আমারই কনিষ্ঠ পুত্র। ডি পি এল-এর সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবাসী, কুয়েতে থাকে। বিবাহিত। আমার তিনটি কন্যা আছে। বড় ও মেজো বিবাহিতা। বড় দিল্লিতে এবং সেজো ডিব্রুগড়ে থাকে। আমার কনিষ্ঠা কন্যা স্কুলের ছাত্রী। আমার কনিষ্ঠ পুত্র বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল ছিল। কৃতিত্বের সহিত সি এ পাশ করিয়া আপাতত ষোল শত টাকা বেতনের চাকরি করে। দুর্গাপুরে কোয়ার্টারও পাইয়াছে। শীঘ্রই পদোন্নতির সম্ভাবনা। আমরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পূর্বনিবাস কুষ্ঠিয়া। বংশগত পদবী সান্যাল, তবে আমরা রায় পদবীই ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরি হইতে অবসর লইয়াছি। দিল্লিতে খাদ্য দফতরে দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলাম এবং সেই পদ হইতেই অবসর গ্রহণ করিয়া পেনশন ভোগ করিতেছি। আমরা পাঁচ ভাই ও দুই বোন। আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ রীতিমত বিখ্যাত ব্যক্তি। সমাজসেবী মহীতোষ রায়ের নাম হয়তো শুনিয়া থাকিবেন। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় তিনি গ্রামোন্নয়নের কাজ করিতেন। মধ্যপ্রদেশে তিনি একটি কুষ্ঠাশ্রমও স্থাপন করেন। কিছুকাল আগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমার মধ্যমাগ্রজ ইছাপুরের গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণের পর গানবাজনা লইয়া থাকেন। তৃতীয় আমি। চতুর্থ ভ্রাতা সরকারী কলেজের অধ্যাপনা করিত। দর্শনের এম এ। অকালে তাহার মৃত্যু ঘটে। পঞ্চম ভ্রাতা বাংলাদেশে। আমাদের কুষ্ঠিয়ার জমিজমা সেই দেখাশুনা করে। সে অবিবাহিত। আমার দুই ভগ্নীই আমার ছোটো। বড় ভগ্নীপতি বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ব্রহ্মপদ বাগচী। ছোটো ভগ্নীপতি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ডিভিসি-তে কর্মরত অবস্থায় এক দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ছোটো ভগ্নী কলিকাতায় বাড়ি করিয়া বসবাস করিতেছে। তাহার একমাত্র পুত্রও ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিভিসি-তেই

কর্মরত।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র বেশ দীর্ঘকায়। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। বয়স সাতাশ, পাত্রী দীর্ঘকায়া হইলে ভাল। না হইলেও ক্ষতি নাই। প্রকৃত সুন্দরী ও যথার্থ সংগীতজ্ঞা হইলে আর কোনও বাধা থাকিবে না। আমাব পুত্রের গানের দিকে খুবই ঝোঁক। আমি নিজে গান না জানিলেও আমাদের বাড়িতে ওই বিষয়টির খুব রেওয়াজ। আমাদের কোনও প্রকার দাবী-দাওয়া নাই। পাত্রীই বিবেচ্য।

পবিশেষে নিবেদন করি, আমার মধ্যম কন্যা আমাদের অমতে বিজাতীয় বিবাহ করিয়াছে। ছেলেটি এমন কি হিন্দুও নহে। এই কন্যার সহিত আমাদের এখন কোনও সম্পর্ক নাই। ঘটনাটি গোপন করিয়া বিবাহকার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নয় বিবেচনা করিয়া আপনাকে বিশদ জানাইলাম। ইহা জানিয়া যদি অগ্রসর হন তবে আমরা পাত্রী দেখিতে প্রস্তুত।

নমস্কার জানিবেন।

বিনীত

শ্রীপরিতোষ রায়

চিঠিটা তিনবার পড়ল তিথি। না, পূর্বা গান জানে না। দিদির বয়স চব্বিশ। দীর্ঘকায়া নয়। সুন্দরী বলা চলে না। তাহলে? বিয়েটা কি হবে? হওয়া কি উচিত?

দিদির বিয়ে হয়ে গেলে ভারী একা লাগবে তিথির। দিদিটা তার বড্ড বন্ধু ছিল। কিন্তু আর বুড়িয়ে যাওয়ার আগেই বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার ওর। চব্বিশ তো কম নয়। ডেইলি প্যাসেনজারি করে করে কেমন দরকচা মেরে যাচ্ছে চেহারাটা। আর বেশি দেরী কবলে আসল বয়সটা কেউ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু এখানে হবে বলে মনে হয না। প্রকৃত সুন্দবী, সঙ্গীতজ্ঞা, দীর্ঘকায়া। কত কী চেয়েছে।

রাত্রিবেলা দুই বোন যখন অন্ধকারে এক বিছানায় একা হল, তখন তিথি বলল, চিঠিটা পড়েছিস দিদি?

পূর্বা ম্লান গলায় বলল, পড়েছি।

কী মনে হয়, হবে এখানে?

ধুস। দুর্গাপুরে কে যাচ্ছে? আমি কি চাকবি ছাড়বো না কি?

ছাড়বি না?

পাগল! পারমানেন্ট পোস্টের চাকবি ছেড়ে একজন পুরুষের গোলামি কবতে যাবো কোন দুঃখে। অমন বিয়েব দবকাব নেই।

খুশির গলায় তিথি বলল, সেই ভাল রে দিদি, কলকাতায় বিয়ে কর। ছুটে ছুটে গিয়ে তোকে দেখে আসতে পাবব।

বিয়ের কথা আর বলিস না তো। ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। অচেনা বাড়িতে গিয়ে বউ হয়ে উঠব, কেমন লোক সব কে জানে, দেরে হয়তো গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে।

উঃ, যা হচ্ছে না আজকাল ! আমারও বিয়ের কথা ভাবতে ভয় করে।

পূর্বা অন্ধকারে একটু হেসে বলল, ভয় করে ঠিকই। আবার ভাবি, বাকি জীবনটা একা একা কাটাবোই বা কী করে ! ভীষণ বোর লাগবে না !

বোর লাগবে কেন ! কত কী করার আছে মেয়েদের। আমার খুব ইচ্ছে কী জানিস, একটা অনাথ আশ্রম খুলব, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে হৈ-চৈ করে কাটিয়ে দেব সময়টা।

পূর্বা চুপ করে শুনল। তারপর বলল, কত কী ইচ্ছে আমাবও হয়। পুরুষ জাতটাকে কেমন যেন সহ্যও করতে পারি না। আবার ভেবে দেখি, ভগবান যখন দুটো জিনিস তৈরি করেছেন তখন দুটোরই নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আসলে কী জানিস, খবরের কাগজে যখন বউ পোড়ানোর খবর বেরোয়, রাস্তায়-ঘাটে যখন ল্যালা পুরুষেরা পিছনে লাগে বা চারদিকে যখন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষগুলোকে দেখি তখনই মনটা তেতো হয়ে যায় ! কিন্তু এরকম ছাড়াও তো পুরুষ আছে, যাবা সৎ, চবিত্রবান, ব্যক্তিত্ববান বা আদর্শবান।

তিথি একটু ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, ওসব কথা ভুলে যা। আজকাল আর ওরকম পুরুষ খুঁজে পাবি না। সব মেরুদণ্ডহীন, স্বার্থপব, হ্যাংলা।

আর আমরাই কি ভাল ? এখানকার মেয়েরাও দেখ, কেমন যেন হায়া লজ্জা কম, কেমন ছেলে-ছেলে ভাব। শবীব-সর্বস্ব মেয়ে দু' চোখে দেখতে পারি না।

দুর্গাপুরের সম্বন্ধটা নিয়ে মা বা বাবা তোকে কিছু বলেছে ?

চিঠিটা পড়তে দিয়েছিল। তারপর মতামত জানতে চাইল। আমি কিছু বলিনি।

বলিসনি কেন ?

কী বলব তা ভাবছি।

তার মানে তোর একটু একটু ইচ্ছে আছে।

পূর্বা একটু চুপ করে থেকে বলল, না, তা নয়। ছেলেটার যা বয়স তাতে আমার সমানই প্রায়। আমি কেমন যেন বরের সঙ্গে সমান বয়সী কনে সহ্য কবতে পারি না। একটু বযসের তফাত না থাকলে লোকটাকে ঠিক রেসপেক্ট করা যাবে না।

রেসপেক্ট ! বলিস কী ? রেসপেক্ট করতে যাবি কোন দুঃখে ? বরকে আজকাল কেউ রেসপেক্ট করে না। বর হল ফ্রেন্ড।

আমার তো মনে হয় শ্রদ্ধা না থাকলে ঘর করারই মানে হয় না।

আমার বাবা শ্রদ্ধা-ফ্রদ্ধা সহ্যই হবে না।বরের সঙ্গে ইয়ার্কি করব না ?

শ্রদ্ধা রেখেও ইয়ার্কি করা যায়।

বর হল স্রেফ বেড মেট, ফ্রেন্ড, পার্টনার।

সেটা তোর কাছে। আমার ওরকম ভাল লাগে না।

তুই যা সেকেলে না, একেবারে আদ্যাসুন্দরী দেবী। আমার তো বেশ সমান সমান ছেলেই পছন্দ। অবশ্য বিয়ের কথা মোটেই ভাবছি না।

পূর্বা পাশ ফিরে বোনের দিকে মুখ করে শুয়ে বলল, বিয়ের কথা না ভেবে কোন্ মেয়ে পারে বল তো ! একটা বয়সে এসে ভাবতেই হয়।

কেন বল তো !

পূর্বা আবার একটু ভাবল। তারপর বলল, এই যে দেখ, তোদের নিয়ে বেশ আছি। মা-বাবা-ভাই-বোন নিয়ে বেশ হৈচৈ করে সময় কেটে যায়। কিন্তু এরকম তো চিরকাল থাকবে না। মা-বাবা বুড়ো হবে, ভাই বিয়ে করে বউ আনবে, তুই চলে যাবি পরের ঘরে, তখন আমি কী নিয়ে থাকব ? গুচ্ছের পরীক্ষার খাতা, চোখে চালসে, আর বিগড়োনো মেজাজ নিয়ে খিটখিটে হয়ে যাব। কেন জানিস, একটা কাউকে বা কিছুকে সর্বস্ব দিয়ে ভাল না বাসলে জীবনের রসটাই মরে যায়, আনন্দ থাকে না।

তিথি অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, আমরা আজ কিন্তু বেশ সিরিয়াস সিরিয়াস কথাবার্তা বলছি, না রে দিদি ? একটু হাসির কথা বল না।

পূর্বা একটু হাসল। তারপর বলল, গভীরভাবে ভাবলে কিছুতেই হাসির কথা মনে পড়ে না। হাসি শুকিয়ে যায় রে। মেয়ে হয়ে জন্মানোটা যে কী পাপ।

অত ভাবিস কেন তুই বল তো ! দিন দিন বড্ড গোমড়ামুখো হয়ে যাচ্ছিস। আমার তো কিছু খারাপ লাগে না। খুব হোঃ হোঃ করে হাসতে ইচ্ছে করে, গাইতে ইচ্ছে করে, মনে হয় মেয়ে হয়ে জন্মানোটারও কতগুলো প্লাস-পয়েন্ট আছে।

পূর্বা চুপ করে রইল। তারপর বলল, জোজো না কী নাম যেন ছেলেটার ! যার কথা বলছিলি !

উঃ, একদম পাগল।

মেয়ে দেখলেই বুঝি রেগে যায় ?

ভীষণ। কোন মেয়ে যেন হাফসোল দিয়ে গেছে। এখন যত রাজ্যির রাগ

মেয়েদের ওপর।

তবু যা হোক, হ্যাংলা তো নয়। তোর কেমন লাগল ছেলেটাকে ?

প্রথমে তো ভীষণ ইনসাল্ট করেছিল। রেগে গিয়েছিলাম। পরে একটু কষ্ট হল। আমি তো সত্যিই কাজটা ভাল করিনি। অ্যাকসিডেণ্টের পর জিমিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

ছেলেটা এখন কেমন আছে ?

বোধহয় ভালই। খবর তো আর নিইনি। ইনজুরি তেমন নয়।

তাহলে একদিন নিয়ে আসিস বাড়িতে। কথা বলে দেখব।

যদি আসে। যা দেমাক!

পূর্বা একটু হাসল। বলল, দেমাক কি তোরই কিছু কম ?

যাঃ, আমার মোটেই দেমাক নেই।

যার থাকে সে কি টের পায় ? আমি তোর কথা যত ভাবি তত মনে হয়, তিথিটার যা দেমাক, ও বিয়ের পর সুখী হলে হয়!

দেমাকের সঙ্গে সুখের আবার কী সম্পর্ক ?

তুই যে কাউকে তেমন করে ভালবাসতে পারবি না।

তোর মতো দাস্যভাব আমার নেই। আমার ভালবাসা অন্যরকম।

আমার বুঝি দাস্যভাব আছে ?

খুব। এই যে একটু আগে বলছিলি কাউকে পাগলের মতো সর্বস্ব দিয়ে ভাল না বাসলে জীবনের রস থাকে না।

পূর্বা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, এটাকে দাস্যভাব বলে ? আমার তো তা মনে হয় না। আমি তো তোদের সবাইকে এত ভালবাসি, তবু মনে হয় আমার বুকের ভিতরে যেন কেমন আর একটা সাংঘাতিক পাগলাটে ভালবাসা রয়েছে। তেমন কাউকে পেলে সে ভালবাসা বন্যার মতো বেরিয়ে আসবে।

আমার অত ভালবাসা-ফাসা নেই বাবা।

পূর্বা ফের একটু হেসে বলল, তাহলে বেঁচে গেছিস। ভালবাসার বড় জ্বালা।

ভালবাসার কথা দুরকম ভাবে ভাবতে ভাবতে দুবোন ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

ঘুমের মধ্যেও পূর্বার বুকটা ধক ধক করছিল। একটা অনিশ্চয়তার রেশ হানা দিচ্ছিল তার স্বপ্নেও। অচেনা কোন পুরুষ এসে দাঁড়াবে একদিন সামনে। কী দেবে তাকে পূর্বা ? দেহ ? মন ? আর কী ? আর কী ? আরও যে অনেক কিছু দেওয়ার আছে তার। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না কী।

দুর্গাপুর ? জায়গাটা কেমন হবে ? থাকতে পারবে কি সেখানে পূর্বা ? কেমন

হবে সেই মানুষটা ? নির্দয় ! রাগী ! মেনীমুখো ! ক্ষ্যাপাটে ! বায়ুগ্রস্ত ! কিংবা যদি নপুংসকই হয় !

যখন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠল পূর্বা তখনও এই চিন্তার রেশ তার মাথায় রিমঝিম করছে।

এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পাত্রপক্ষের চিঠি এসেছে। তাকে দেখেও গেছে চার পার্টি। কেউই আর চিঠি দেয়নি। অমনোনয়নের অপমান বুকের মধ্যে বিষ হয়ে আছে বটে। কিন্তু পূর্বা রাগও করে না। সে জানে এভাবেই পছন্দ অপছন্দের দোলাচালে দুলতে দুলতে একদিন দুম করে বিয়ে হয়েও যায়।

সকাল বেলাটা বড্ড তাড়া থাকে পূর্বার। স্নান করে, খেয়ে, টিফিন গুছিয়ে শেয়ালদা গিয়ে ট্রেন ধরা। কাজেই সকালবেলাটায় কিছু ঠাণ্ডাভাবে ভাববার অবকাশ নেই। কিন্তু সকালের ফাঁকা আপ ট্রেনে জানলার ধারে বসে ভাবা যায়।

তারা চারজন সহকর্মী একই ট্রেনে একসঙ্গে রোজ যায়। গল্প করতে করতে পথটুকু ফুরিয়ে যায় এক লহমায়। মাঝে মাঝে পূর্বা একটু আলগা একটেরে হয়ে বসে নানা কথা ভাবে। ভাবতে তার বড় ভাল লাগে।

মাধুরীদি বলল, কী রে, গোমড়া মুখে বসে আছিস যে বড় ? কী হয়েছে ?

কাল এক পাত্রপক্ষ চিঠি দিয়েছে।

পছন্দ করে ?

না, বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তার জবাব।

সে তো অনেক চিঠি আসবে। ভাবছিস কেন ?

পাত্র চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট বলে বাবা একটু বেশী ইণ্টারেস্টেড। কিন্তু আমি তো জানি হবে না।

সব তো জেনে বসে আছিস।

দীর্ঘকায়া, সুন্দরী, সঙ্গীতজ্ঞা চেয়েছে। আমি তো তিনটে পয়েণ্টেই খারিজ।

আমার শ্বশুরমশাই কী চেয়েছিলেন জানিস ? পাত্রী চার ফুট দশ ইঞ্চির বেশী লম্বা হলে চলবে না, গৌরবর্ণা হতে হবে, আরও কত কী। তারপর তো বাবা এই খেঁদী পেঁচীকেই বরণ করে নিতে হল। ওসব ভাবিস না। পাত্রপক্ষের অনেক আম্বা থাকে, পায় নাকি সেরকম ?

আমি তাও ভাবছি না। পাত্রপক্ষ পছন্দ করলেও এ বিয়েতে আমার মত নেই। চাকরি ছেড়ে দুর্গাপুর কে যাবে ? আমি শুধু ভাবছি এই টেনশানটা আর কতদিন সহ্য করতে পারব।

টেনশন আবার কী ? শুধু বসে থাক না চুপচাপ। ঠিক লেগে যাবে।

বেশ বলো তুমি।

তোর বয়স তো মোটে চব্বিশ। এখনই অত ভাববার কী ?

চব্বিশ তো বসে থাকবে না। পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, সাতাশ আটাশ হবে, তারপর···

সত্তর বাহাত্তর হবে। সব জানি, তাতে কী ? আগ বাড়িয়ে ভাবতে বসলে তো বেঁচে থাকাই দায় হবে।

শোভনাদি ডিভোর্সী, কম কথার মানুষ। এতক্ষণ কথাবার্তা শোনার পর মৃদুস্বরে বললেন, বিয়ের কথা ভাববারই বা কী দরকার তোমার ? যা ভাবছো সেরকম নাও হতে পারে। আমার কথাই ভাবো।

মাধুরীদি একটু চড়া গলায় বললেন, তুই চুপ কর তো শোভনা। যা একখানা হনুমানকে পছন্দ করেছিলি। হেমন্তকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনতাম। তখনই জানতাম শোভনার কপালে দুঃখ আছে।

দুঃখ কেন বলছো ? দুঃখের চেয়েও অনেক বেশী হল অপমান।

ওই হল।

পূর্বা ওদের কথা বলতে দিয়ে নিজে আনমনা হয়ে গেল। মেয়ে হয়ে না জন্মালে সে একদিন ঠিক বাবাজী বাউণ্ডুলে হয়ে যেত। ছেলেরা কেউ কেউ যেমন হয়। কিন্তু মেয়েদের ঘর ছাড়তে হলেও কারও হাত ধরেই ছাড়তে হবে, না হলে গিয়ে পড়তে হবে কারও খপ্পরে বা আশ্রয়ে। এ সমাজে একাকিনী কোনও মেয়ের বিবাগী হওয়ার উপায় নেই।

★ ★ ★

আপনারা বাঙালীকে দেখছেন না স্যার। বাঙালী হয়ে যদি বাঙালীকে না হেল্প করেন তাহলে কী করে বেকারী দূর হবে বলুন, আমার প্রোজেক্ট তো দেখছেন, জব ওরিয়েন্টেড, অন্তত জনা দশেক ছেলে চাকরি পাবে।

অত বাঙালী-বাঙালী করছেন কেন ? বাঙালী কী ভাল ? আমরা এ পর্যন্ত যত লোককে লোন দিয়েছি তার মধ্যে বাঙালীই বেশী ডিফল্টার।

নন-বেঙ্গলীরা ব্যবসায়ী জাত। কিন্তু বাঙালীকে তো ব্যবসামনস্ক হওয়ার সময় দিতে হবে স্যার। ঠেকে ঠেকে শিখবে।

বাঙালী ঠেকে শিখুক, কিন্তু মশাই, আমার চাকরি তো আর ঠেকে শিখবে না। আপনি দিন সাতেক পরে আসুন। ইন্সপেকশন রিপোর্টটা দেখি, তারপর যা হোক ডিসিশন নেবো।

বিজয় কী করবে বুঝতে পারছিল না। তার মন বলছে, লোনটা সে পাবে না। তার প্রোজেক্ট প্ল্যান যে খারাপ তা নয়। কিন্তু বাঙালী বলেই তার হবে না। সে

ঘুসও অফার করেছিল ক্যাবলার মতো। কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

বিজয় হতাশভাবে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল। পানের দোকান থেকে একটা ডাব কিনে তেষ্টা মেটাল। তারপর ফুটপাথে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দুশ্চিন্তা করল।

চাকরিটা একরকম ছেড়েই দিয়েছে সে। দিন দশেক অফিসমুখো হয়নি। লোনটা পাবে-পাবে করে অনেক আশায় ছিল। তার বাবাও যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। এই ব্যাংকের এজেন্ট তার বাবার চেনা, তবু কোথায় একটা গাঁট রয়ে গেছে, খুলছে না।

দুশ্চিন্তাটা একটু একটু করে বাড়ছে। ভারী হতাশা বোধ করছে বিজয়। তার সামনে এমন একটা শূন্যতা, যা অর্থহীন, অন্তহীন, সম্ভাবনাহীন।

বিজয়ের তেমন কোনও বন্ধু নেই। ছেলেবেলা থেকেই কেন কে জানে তার তেমন বন্ধু জোটে না। জুটলেও টিকে থাকে না। আজ এই পঁচিশের কাছাকাছি বয়সে নিজের নিকট আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কারও সঙ্গেই তার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। এই যে শহর, সমাজ, রাষ্ট্র এর কিছুর সঙ্গেই সে জড়িত নয়। কোনও এক সময়ে সে একটু রাজনীতি করেছিল। সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। রাজনীতির চেঁচামেচি এবং ঝগড়া কাজিয়ায় অতিষ্ট হয়ে সে পালিয়ে বাঁচল। দেশ বা রাষ্ট্র বা জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার সেইখানেই ইতি। অথচ তার খুব ইচ্ছে করে এই রমরমা পৃথিবীর সঙ্গে, এই চারদিককার মানুষজনের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে।

কেন পারল না বিজয়? কেন একা হয়ে গেল?

এই একাকীত্ব আজকাল বড় অসহ্য লাগে। যে কোনও হতাশা, দুঃখ, ব্যর্থতার সময় একজন কারও কাছে গিয়ে হাজির হতে ইচ্ছে করে তার। কেউ তার দুঃখের ভাগীদার হোক, দুটো মিষ্টি কথা বলুক, আশা-ভরসা দিক, এইটুকু আকাঙ্ক্ষা তার। কিন্তু হায়, এইটুকুই সে পায়নি কখনও।

জিমির সঙ্গে তার ভাব আছে বটে, কিন্তু জিমি বৃহত্তর পৃথিবীর লোক, দশটা কাজ তার। যেখানেই যাচ্ছে, যতই অচেনা পরিবেশ আর প্রতিকূল পরিস্থিতি হোক, চোখের পলকে তা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে। চারদিককার সঙ্গে তার যোগাযোগ চমৎকার।

বিজয় কেন নয় জিমির মতো?

অসহায় এক উত্তেজনায় বিজয় ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। পঁচিশের কাছাকাছি এই যুবা বয়সে সে যদি এই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রচনা না করে থাকতে পারে তাহলে আর কবে পারবে? সে আজও কোনও যুবতীর সঙ্গে

সম্পর্ক পাতাতে পারেনি, মেয়েদের সে লজ্জা ও ভয় পায়। কেনই বা এরকম হবে ?

এই যে ব্যাংকের লোনটা সে পাচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করেও লোকটা কনভিনসড হচ্ছে না, এটা শুধু তার বেলাতেই হয়। জিমি হলে কবে লোন বাগিয়ে বেরিয়ে যেত। তার ধরাকরার লোক নেই, কারও কাছে গিয়ে সমস্যার সমাধান জেনে আসার উপায় নেই।

সোজা কথা আজ অবধি বিজয় কোনও মানুষকেই উপার্জন করতে পারেনি।

বিজয় অতি দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগল। রাস্তায় এই ভরদুপুরে হাজারটা মানুষ, অথচ কারও সঙ্গেই তার চেনা নেই, আলাপ নেই। সে মাইলের পর মাইল ভীড়ের মধ্যে হেঁটে গেলেও একটা চেনা মানুষ্ তার চোখে পড়বে না। এ এক ভীষণ অবস্থা। এ এক সাঙঘাতিক অনুভূতি।

'আমার কেউ নেই' এর মতো ভয়াবহ চিন্তা আর কিছুই হতে পারে না।

বিজয় আজ লোভীর মতো জনস্রোতের দিকে চেয়ে হাঁটছে। খুব ইচ্ছে করছে কারও সঙ্গে কথা বলতে। অনেকক্ষণ ধরে বলে বলে বুকের সব কথা খালাস হয়ে গেলে সে খুব আরাম পেত। তুচ্ছ সব কথা, ছোটো ছোটো দুঃখ বেদনার কথা, হতাশার কথা। এই যে বিজয় চট্টোপাধ্যায নামে একজন যুবক বিশ শতকেব শেষ দিকে কলকাতায় জ্যান্ত রযেছে তার অস্তিত্বের খবরই যে কেউ রাখে না। একে কি বেঁচে থাকা বলে ?

আচ্ছা যদি সে এখন কোনও একজন লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে ? কি হয় তাহলে ?

বাস স্টপে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় তাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। যদি সুযোগ হয়, যদি ঘটনাক্রমে কারও সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় তাহলে বিজয় খানিকটা ঠাণ্ডা হবে।

সবুজ হাওয়াই শার্ট পরা একজন তারই বয়সী ছেলেকে বিজয়ের পছন্দ হল। বেশ অমায়িক এবং ভদ্র মুখাবয়ব। বিজয় তার দিকে চেয়ে রইল, যদি তাকায়।

ছেলেটা তাকাল।

চেষ্টাকৃত একটু হাসি হাসল বিজয়।

ছেলেটা হাসবে কি ?

না, হাসল না। মুখটা ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। হয়তো পাগল ভাবছে। এভাবে হয় না। হবে না। বিজয় পারবে না।

বিজয় পিছিয়ে এল। আরও খানিকটা হাঁটল, ফের দাঁড়াল এক স্টেশনারি দোকানের সামনে। দোকানে খদ্দেব নেই। এক ছোকরা বসে খবরের কাগজ

পড়ছে।

দোকানদারের সঙ্গে আলাপ করা সবচেয়ে সোজা। কিছু একটু কিনলেই সামান্য কথা হয়েই যায়। তা থেকে সুতো ধরে এগোলে...

বিজয় ঢুকে পড়ল দোকানে।

ছোকরা খবরের কাগজটা অলস হাতে নামিয়ে একটু উঠবার চেষ্টা করল।

বিজয় হেসে বলল, ইয়ে সেলো টেপ আছে?

আছে।

ছেলেটা উঠে শোকেসের পাল্লা টেনে সেলো টেপ বের করল।

বিজয় মানিব্যাগ বেব করে বলল, কত?

সাড়ে তিন টাকা।

দাম দিতে পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বিজয় বলল, খুচরো নিয়ে যা প্রবলেম চলছে।

ছোকরা জবাব না দিয়ে নোটটা নিয়ে ড্রয়ার খুলে ফেবত পয়সা বের করল।

বিজয় প্রাণপণে নিজের ওপর নিযন্ত্রণ রেখে বলল, আপনাদের এই দোকান কত দিনের?

তা বছর পনেরো হল।

আপনিই শুরু করেছেন?

না, আমার বাবা।

বিক্রিবাটা কেমন?

ওই টুকটাক চলে যায়। কেন বলুন তো?

বিজয় আমতা আমতা কবে বলল, কি জানেন, আমার একটা দোকান দেওয়ার শখ অনেক দিনেব। নানারকম জিনিস থাকবে, নানারকম খদ্দের আসবে, সারাদিন লেনদেন হবে। বেশ চমৎকার একটা ব্যাপার, তাই না?

ছোকরা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, দোকানে কোনও সুখ নেই দাদা। করলে বুঝতেন। সারাদিন ফালতু বসে মাছি তাড়ানো।

না না, দোকানদারি মানে তো শুধু কাজ নয়। এ হল লোকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার একটা ভাল জায়গা।

ছেলেটা খববের কাগজটা খুলে বলল, তা হতে পারে।

আর কথা এগোবে না। এগোনোর কথাও নয়। বিজয় একটা শ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল, ছেলেটা ডেকে বলল, জিনিসটা যে ফেলে যাচ্ছেন দাদা।

অকাজের সেলোটেপটা নিয়ে বেরিয়ে এল বিজয়। বেকার পকেট থেকে সাড়ে তিনটে টাকা গচ্চা গেল। সাকুল্যে একশো শব্দেরও বোধহয় বিনিময়

ঘটেনি।

এভাবে হয় না।

বিজয় ফেব হাঁটতে লাগল। তাবপব অচেনা রুটেব বাসে উঠে বিচিত্র সব জায়গায় চলে গেল। ট্যাংরা, পুঁটিয়ারি, খিদিরপুর, না এভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রচনা অসম্ভব।

ক্লান্ত বিজয় অবশেষে হানা দিল জিমিদেব ধর্মতলাব দোকানে। দোকান সামলায় জনি। সে-ই ছিল। একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। একটু উন্মনা।

জনি, কী খবর? জিমি ফিরেছে?

আরে হ্যাল্লো বিজয়, জিমির তো আজ মর্নিং ফ্লাইটে ফেরাব কথা! বোধহয় ফ্ল্যাটে আছে।

বিজয় লক্ষ্য করেছে জনি বা জিমির কখনও মুড খারাপ থাকে না। থাকলেও তা চেপে রেখে এক ধরনের ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার করে যেতে পারে লোকের সঙ্গে। দারুণ ক্ষমতা।

দোকানে অন্তত জনা সাত আট খদ্দের। দুজন বাঙালী সেলসম্যান হিমসিম খাচ্ছে। জনিও প্রবল ব্যস্ত। কথা এগোবে না।

কর্মব্যস্ত দোকানটার মধ্যে অপ্রতিভ বিজয় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কেনাবেচা। লেনদেন। যোগাযোগ।

বিজয় কি এরকম একখানা দোকানই দেবে শেষ পর্যন্ত?

আচ্ছা জনি আজ আসি।

মিট ইউ এগেন। বাই।

বিজয় বেরিয়ে এল। একজন বেশ সুন্দুরী, মোটাসোটা মহিলা তার গা ঘেঁষেই ঢুকে গেল দোকানে। হাবভাব খদ্দেরের মতো নয়।

বিজয় একটু দাঁড়াল। পিছু ফিরে দেখল, মহিলা দোকানের কাউন্টারের পাটা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে।

জনির মুখচোখ উজ্জ্বল হল। বলল, হাই অনু!

মহিলা বলল, চল। নো টাইম।

জনি অতি দ্রুত মেশিনগানের মতো কয়েকটা নির্দেশ তার কর্মচারীদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল মহিলার সঙ্গে।

বিজয়কে তারা লক্ষ্যই করল না।

লাল টুকটুকে মারুতি গাড়িতে উঠে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

বিজয় সবই দেখল। তার মারুতি নেই, মহিলা নেই, দোকান নেই, স্বাস্থ্য নেই, টাকা নেই। শুধু সে আছে। তার মতো মানুষেরা কেন আছে পৃথিবীতে?

পারপাসটা কি ? সৃষ্টিকর্তা বলে যদি কেউ থেকেই থাকে, অর্থাৎ সুপার ব্রেন, তাহলে তার তো একটা প্ল্যান থাকবে, একটা উদ্দেশ্য থাকবে। বিজয় চাটুজ্জে নামক এই নিরামিষ মানুষটিকে সৃষ্টি করার পিছনে তাঁর প্ল্যানটা কী ? কোন কাজ তিনি করাতে চান তাকে দিয়ে ?

আর যদি ঈশ্বর নাও থেকে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হল, কোনও না কোনও অজ্ঞেয় প্রাকৃতিক যে যোগসাজসে সে এই দুনিয়ায় এসে গেছে। কিন্তু কেন ? কেন জন্মাল সে ? না জন্মালে কী আসত যেত ? সে কি কোনও অঘটন ? পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নিরন্ন, দুঃস্থ, অজ্ঞান, অশিক্ষিত, ভিখিরি বা পাগল এরাই বা কেন জন্মায় ?

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এল বিজয়। ফিরে দেখল, বাইরের ঘরে সকলে হৈ-চৈ করছে। জিমি আছে, আর একটা অচেনা ছেলেও।

জিমি উঠে বলল, হ্যাল্লো বিজয়, মিট, মিট জোজো।

জোজোকে দেখে বিজয়ের এক পলকেই ভাল লাগল। লম্বা সুন্দর ফিগারের বাঙালী ছেলে। মুখে গাম্ভীর্য আছে। মনে হয় চিন্তাভাবনা করে, শুধু ঘটনার স্রোতে ভেসে যায় না। একেই বোধহয় ব্যক্তিত্ব বলে।

বিজয় খুশি হল। অন্তত আজ অনেক দিন পর নতুন কারও সঙ্গে আলাপ তো হবে।

লম্বা সোফায় জোজোর পাশেই বসল বিজয়। বলল, আপনার নাম কি শুধুই জোজো ? জোজো তো ডাকনামের মতো শোনাচ্ছে।

জোজো আমার ডাকনামই। পোশাকী নাম অমল চক্রবর্তী।

জিমির সঙ্গে কোথায় আলাপ ?

জোজো একটু হাসল। বলল, জিমির স্কুটারে ধাক্কা খেয়ে তবে আলাপ। রীতিমত অ্যাকসিডেন্টাল।

ওঃ, আরে ! সেই ঘটনা ! তাই বলুন, আপনার কথা তো ওদের মুখে শুনেছি। ইনসিডেন্টালি আমার বোন তিথিও সেই স্কুটারে ছিল তখন, তাই না ?

তিথি ওপাশ থেকে লাজুক গলায় বলল, ও প্রসঙ্গটা থাক না দাদা।

থাকবে কেন ? ইউ আর এ কাওয়ার্ড।

তিথি ঘর থেকে উঠে চলে গেল।

জোজো নরম গলায় বলল, কাওয়ার্ড আমরা সকলেই। ওঁর দোষ কী ?

কথা শোনার জন্য এবং কথা বলার জন্য এতই উদগ্রীব ছিল বিজয় যে এই সামান্য কথাতেই সে খুশি হয়ে খুব হাসল। তারপর বলল, একজ্যাকটলি, একজ্যাকটলি। আমরা সবাই কাওয়ার্ড, ভীষণ কাওয়ার্ড। আমি নিজে এত

কাওয়ার্ড যে শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

জোজো সামান্য হেসে বলল, তাই নাকি ? কিন্তু হয়তো যতটা ভাবছেন ততটা আসলে নন।

না মশাই, আমি যে ভীষণ কাওয়ার্ড তা আমি খুব ভাল জানি।

জোজো ফের একটু হাসল। তারপর বলল, যুদ্ধে যাওয়ার আগে অনেকেই ভীষণ ভীতু থাকে। কিন্তু ফ্রন্টে গেলে দেখা যায়, সবচেয়ে কাপুরুষ ছিল যে ছেলেটা তারই দাপটে প্রতিপক্ষ অস্থির। আমরা কাওয়ার্ড কেন জানেন ? নিজেদের কাওয়ার্ড ভাবি বলে।

কারও সঙ্গে একমত হওয়ার জন্য বিজয় এতই ব্যস্ত ছিল যে, কথাটা সে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলল, ঠিক বলেছেন, অতি ঠিক কথা। আমাদের সকলেরই বোধহয় একটু মিলিটারি ট্রেনিং-এর দরকার ছিল। আমাদের দেশে ভালমতো একটা যুদ্ধও হল না। কী একটু ঠুকঠাক লড়াই হল পাকিস্তানের সঙ্গে, একটু হাডুডু খেলা হল চীনের সঙ্গে। সেভেন্টি ওয়ানে একটাই গ্লোরিয়াস লড়াই হয়েছিল, বাংলাদেশে। কিন্তু তাতে আমাদের কোনও ভূমিকা ছিল না, একটা ভালরকম যুদ্ধ না হলে আমাদের জড়তা কাটবে না, কিছুতেই কাটবে না।

বিজয়ের এক্ষুনি যুদ্ধে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু হায়, যুদ্ধ তো কোথাও হচ্ছে না।

জোজো নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কী করেন ?

সামান্য একটা চাকরি ব্যবসার চেষ্টা করছি, যদি ব্যাংক লোন পাই। আপনি ?

আমারও খুব সামান্য একটা চাকরি।

কিছু করার প্ল্যান আছে ?

প্ল্যান ? না, কিছু প্ল্যান নেই।

তাহলে আমার সঙ্গে জয়েন করুন না।

আপনার সঙ্গে ?

নয় কেন ? আসলে আমি বড্ড লোনলি, একা কিছুই করে উঠতে পারছি না। এমন কি লোনটা পর্যন্ত আনসার্টেন ! অর্ডারি কবে হবে কিছু ঠিক নেই। যদি একজন সঙ্গী পাই···

আপনার কোনও পার্টনার নেই ?

বিজয় মাথা নেড়ে বলল, আমি ফ্রেণ্ডলেস। সব বুঝিয়ে বলতে পারব না আপনাকে। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় ড্রব্যাক হল, আমি টোট্যালি ফ্রেণ্ডলেস্। আমার ঘরে আসবেন একটু ? পাশেই। চলুন আপনাকে আমার প্ল্যানটা দেখাই।

জোজোর মুখ দেখে বিজয়ের মনে হল ছেলেটা তাকে তেমন অপছন্দ করছে

না, সন্দেহ করছে না, পাগল বলেও ভাবছে না। বরং বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এটা লক্ষ্য করে বিজয় খুশি হল। বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। তার এক্ষুনি একজন বিশ্বস্ত বন্ধু দরকার। যার ওপর সে নির্ভর করতে পারে। জোজো কেমন ছেলে তা সে এখনও জানে না। কিন্তু বাছাবাছির সময়ও তো তার নেই।

জোজো উঠে বলল, চলুন।

নিজের ঘরে এনে জোজোকে যত্ন করে বসাল বিজয়। তারপর সব কাগজপত্র বের করে বোঝাতে লাগল।

খুব মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল জোজো।

★ ★ ★

কী কথা হল রে ছেলেটার সঙ্গে তোর ?

তা দিয়ে তোর কি দরকার ?

তুই কি ওকে বিজনেস পার্টনার করছিস নাকি ?

করতে পারি।

চিনিস না, জানিস না, হুট করে একটা লোককে কেউ বিজনেস পার্টনার করে নাকি ? তোর কী হয়েছে বল তো ?

বিজয় তিথির দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে বলল, কেন, জোজো কি খারাপ ছেলে ?

আমি মোটেই তা বলিনি। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল তো।

অত সাধু ভাষায় বলতে হবে না। ছেলেটাকে আমার ভাল লাগল তাই বললাম আমার প্রজেক্টে জয়েন করতে।

জয়েন যে করবে—ও কি টাকা দেবে তোর প্রজেক্টে ?

দ্যাখ, অত হিসেব করতে গেলে কাজ হয় না। ও আমার মতোই একটা বাজে চাকরি করে। প্রায় বেকার। আমি যদি ব্যাঙ্ক লোন পাই তাহলে ব্যবসায় তো লোক নিতেই হবে। তাছাড়া ব্যাঙ্ক আমাকে একা লোন দিতে চাইছেও না। পার্টনারশিপ হলে তাড়াতাড়ি হবে।

কেন, আমরা দুই বোন আর মা তোর পার্টনার হলে আপত্তি কি ?

আপত্তি নেই। কিন্তু তোরা হবি স্লিপিং পার্টনার। কাজের পার্টনার অন্যরকম। ছেলেটা বলতে কইতে পারে, সাহসও আছে। হয়তো লড়ে যাবে। তোর ছেলেটার ওপর এত রাগ কেন ?

মোটেই রাগ নয়।

তোকে বোধহয় তেমন পাত্তা দেয়নি।

পাত্তা চাইছে কে ?

বুঝেছি। আর পাকামি করতে হবে না।

বাবা আর মাও কিন্তু বলছিল—বিজয়টার বুদ্ধি এত কম, হুট করে একটা ছেলেকে প্রথম দেখেই—

বিজয় ক্রমশ বিমর্ষ হয়ে পড়ছিল। বাস্তবিক, কাজটা হয়তো ঠিক হল না। জোজোকে সে তো তেমন ভাল করে চেনে না। ছেলেটা যদি ভাল স্বভাবের না হয়। যদি মস্তান বা জোচ্চোর হয়! যদি… ! কত যদি আছে।

বিজয় বলল, ঠিক আছে। ভেবে দেখব। জাস্ট একটা প্রোপোজাল দিয়েছি। ব্যাঙ্ক লোন পাওয়ার আশা কম। বিজনেস না হলে তো পার্টনারশিপেরও কোন মূল্য নেই।

তিথি কথা শেষ হওয়ার পরও চলে গেল না। বসে রইল।

দাদা, তোকে একটা কথা বলব ?

কী কথা ?

আমি যদি তোর পার্টনার হই তাহলে কিন্তু আমি চুপ করে থাকব না। আমি কাজ করব।

করবি তো কী ? বারণ করেছে কে ?

তখন ধমকে সরিয়ে দিবি না তো ?

না। তবে মেয়েদের দিয়ে তো সব কাজ হয় না।

মেয়েদের অত আন্ডার-এস্টিমেট করিস কেন ? এই কিছুদিন আগেও ইন্দিরা গান্ধী…

রাখ তো। কেবল ইন্দিরা গান্ধীকে দেখালেই হবে ? ইন্দিরা একটা একসেপশন। একসেপশনকে কখনও একজামপল হিসেবে দাঁড় করানো যায় না।

তুইও জোজোর মতোই কিন্তু দাদা। তোদের খুব মিল।

কেন, জোজোর আবার কী দেখলি ?

মেয়েদের সম্পর্কে জোজোর ধারণাও একই রকম।

বিমল, অন্বেষা, জোজো,কালীকিংকর,নানা উপলব্ধি

জোজো ! জোজো ! এই জোজো !

কে ?

আমি বাবা। পাশ ফিরে শো, তোকে বোবায় ধরেছে।

ওঃ।

স্বপ্ন দেখছিলি না কি ?

সব সময়েই তো দেখি। সবই দুঃস্বপ্ন।

একটু জল খা।

জোজো জল খেল। তারপর বলল, তুমি জেগে আছো কেন ? শোও গে।

জেগেই তো থাকি। মাঝে মাঝে বায়ু চড়ে যায়। তোর গোঙানির শব্দে উঠে এসে বাতি জ্বেলে দেখি চিত হয়ে বুকে হাত রেখে শুয়ে আছিস। কোমরের ব্যথাটা কেমন ?

বেশি নেই।

তাহলে এখন একটু-আধটু বেরোলেই তো পারিস। অফিসে না যাস না যাবি, বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্পটল্প করলেও তো মনটা হালকা হয়।

ভাল লাগে না। বন্ধু দিয়ে কী হবে ?

সিনেমা দেখিস ?

ভাল লাগে না।

তাহলে ? একটা কিছু নিয়ে তো থাকবি। শুধু শুয়ে শুয়ে ভাবলেই কি ভাল ?

আমার জন্য অত ভাবছ কেন ? ঠিক আছি।

ঠিক থাকলে তো ভালই। কিন্তু ঠিক আর থাকিস কোথায় তোরা ?

বলতে বলতে কালীকিংকর ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

জোজো উঠে বসল। অন্ধকারেই সে চারদিকটাকে অনুভব করল। একটা চৌখুপি ঘর। তার মধ্যে কিছু আসবাব। একটা বাসাবাড়ির গণ্ডীর মধ্যে আত্মীয়তা নামক অদৃশ্য বন্ধনে আটক কিছু স্বার্থপর ধান্ধাবাজ লোক। কয়েকজন পুরুষ ও নারী। তাদের প্রদত্ত নাম কালীকিংকর, অমল বা বিমল, কেয়া বা অন্বেষা। আসলে নামগুলো কিছু নয়। পরিচয়ও কিছু নয়। এরা কেউ কিছু নয়। এই যে এই জায়গাটা এখানে একদিন ডায়নোসর ঘুরে বেড়াত, যখন

মানুষের জন্মই হয়নি। এখানে কি একদা নামগোত্রহীন মানুষেরা পাথরে শিকার করে কাঁচা মাংস খেত না? হ্যাঁ, জোজো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন বুনো মানুষ, তাদের উলোঝুলো চুল, লম্বা নখ, বিচিত্র সব শব্দ করে উবু হয়ে বসে ঠিক পশুর মতো খাচ্ছে, মাঝে মাঝে চমকে চমকে উঠে চারদিকে চাইছে সভয়ে, পরস্পরের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে খাবার।

জোজো কি তখন ছিল? ওদের মতো? বা ওদের মধ্যেই সে-ও কি একজন? বা তারও আগে সে কি ছিল ডাইনোসর? জোজো নিশ্চয়ই ছিল, কোনও না কোনওভাবে। না থাকলে আজকের জোজো এল কোথা থেকে?

জোজো উঠে বাথরুমে গেল। কোমরে ব্যথাটা আর নেই, শুধু ব্যথার একটু স্মৃতি রয়ে গেছে। যদিও মাঝরাত, তবু জোজো মুখে-চোখে জল দিয়ে ঘুমভাব তাড়িয়ে দিল। আর ঘুমোনোর কোনও মানেই হয় না। এই নির্জন সময়, এই নিস্তব্ধ অন্ধকার তার ভাল লাগছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত কেন বলে তা সঠিক জানে না জোজো। কিন্তু তাব মনে হচ্ছিল, এই ঠিক জেগে ওঠার সময়। আর দেরী করা উচিত হবে না।

জোজোর পরনে একটা পাজামা, গায়ে একটা গেঞ্জি। শুধু আলোয়ানটা গায়ে চাপা দিয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

চটির শব্দ যতদূব সম্ভব কম করে সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। সদর খুলে রাস্তায়।

চারদিকে সে যে কলকাতাকে অনুভব করছিল তা আজকের কলকাতা নয়। কোনও শহরই নয। সময়ের একখণ্ড আলোয় চারদিককার নশ্বর নির্মাণ তাকে স্পর্শও করল না। সে হাঁটছিল এক সময়হীন অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ভেদকারী বলয়ের মধ্যে।

পার্কে এই নিশুতি রাতে কেউ নেই। কত রাত তা জানেও না জোজো। সে একটা বেঞ্চে চুপচাপ ঠাণ্ডার মধ্যে এসে বসল। একটু কুয়াশার রহস্যময়তা আছে। আকাশ সামান্য ঘোলাটে। তারার আলো খুব ক্ষীণ। ভাঙা ক্ষয়া এক চাঁদ প্রাণপণে তার সামান্য জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

জোজো একটা কোনায় একটা নড়বড়ে বেঞ্চে বসে আছে। অনুভব করছে নিজেকে, নিজের চারদিককার বিশাল বিশ্বজগৎকে, সময়কে, জন্ম ও মৃত্যুকে। আজ তার মাথা পরিষ্কার। বুকে কিছু স্তব্ধতা। কোনও যন্ত্রণা নেই। সে শান্ত।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে জোজোর নিজস্বতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এমনই তীব্র তার ভিতরকার ইচ্ছাশক্তি, যা ভেদ করতে চায় জন্ম

ও মৃত্যুর রহস্য, যা কিছুতেই সামান্য জানায় খুশি হয় না, যা কেবলই প্রশ্ন করে, কেন জন্ম, কেন নির্যাতন, সেই ইচ্ছাশক্তিই আজ তাকে টেনে এনেছে নিশুত রাত্রির পার্কে। কলকাতা, তবু কলকাতায় নয়, নিশুত রাতে, তবু নিশুত রাতেও নয়।

জোজো কি শুধুই জোজো ? তা কি হতে পারে ? শুধু কি পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে কারও অস্তিত্ব, কারও থাকা না থাকা ? সে ছিল না, সে থাকবে না, তবে মাঝখানে সে আছে কী করে ? এ তো কোনও লজিকেও আসে না।

জোজো স্পষ্ট টের পায় সে ছিল। বরাবর ছিল : সেই ডায়নোসরের যুগে, তারও আগে জলমগ্ন পৃথিবীতে যখন প্রথম অঙ্কুর ফুটল উদ্ভিদের, তারও আগে যখন অগ্নিময় ছিল পৃথিবী, তারও আগে যখন কল্পের শুরু হয়নি, তারও আগে...তারও আগে...

ঝাঁ করে মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল। জোজো আর জোজো রইল না। জোজো মিশে গেল ঘাসে, মাটিতে, বাতাসে, কুয়াশায়। জোজো ছড়িয়ে গেল আকাশে, নক্ষত্রে, আলোয়-অন্ধকারে। কিছুক্ষণ জোজো সম্পূর্ণ মিশে গেল প্রকৃতির সঙ্গে, বিশ্বজগতের সঙ্গে। এক কণ্টকিত আনন্দে শিহরিত হল তার অঙ্গ। হারিয়ে গেল অহংবোধ। কিংবা গোটা বিশ্ব দুনিয়াজোড়া এক নিজেকে পলকের জন্য অনুভব করল সে। দু' চোখ ভেসে গেল জলে।

জোজো শূন্য ধরতে গেল দুহাতে। পারল না। নিরালম্ব তার শরীর উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে। নিবে গেল চোখ, কান, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় চেতনা। শুধু এক ধক ধক শব্দ হতে লাগল কোথায় যেন।

ধক ধক ধক ধক সেই শব্দটুকুই মাত্র তার চেতনাকে ধরে রেখেছিল। আর সেই শব্দই স্পন্দিত হতে লাগল সমস্ত সত্তা জুড়ে।

কে যেন হাত রাখল তার পিঠে। কোমল হাত। নরম স্বরে কে যেন ডাকল, জোজো !

জোজো চোখ মেলল। তারপর উঠল ধীরে ধীরে। কালীকিংকর তাকে ধরে রইলেন আগাগোড়া।

কী হল তোর ? পড়ে গিয়েছিলি ? না কি...

জোজো মাথা নাড়ল, না কিছু হয়নি। চল।

কালীকিংকর একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন।

রাত্রে কালীকিংকর তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন :

"একমাত্র বেদনার ভিতর দিয়া, যন্ত্রণার ভিতর দিয়াই বোধকরি বিশ্বসত্তার সন্ধান করিতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। আজ আমার কনিষ্ঠ পুত্রটির মধ্যে আমি যাহা দেখিলাম তাহাকে কী বলিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার মানসিক কষ্টের একটা আভাস পাইতেছিলাম। তাহার নিঃসঙ্গতা ও নিরন্তর দহনজ্বালাও অনুভব করিয়াছি। জানি, সে মৃত্যুকে চাহে না, কে-ই বা চাহে, তবু মৃত্যুচিন্তা তাহার পিছনে ছায়ার মত ঘোরে। তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারি নাই যে, এই বুড়া বয়সেও এবং এত লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যেও আমার আরও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। ইহা মৃত্যুভীতের কামনা বা ভোগলিপ্সুর বাসনা নহে। ইহা অন্যপ্রকারের জীবনমুখী জৈব চেতনা।

"আমার কনিষ্ঠ পুত্র যখন নিশুতি রাত্রে একপ্রকার গৃহত্যাগ করিল তখন আমি আর থাকিতে পারি নাই। তাহার পিছু লই। যদি সে আবার আত্মহননের চেষ্টা করে তবে তাহাকে ঠেকাইতে হইবে। পার্কে তাহার ধ্যানস্থ মূর্তি আমি লক্ষ্য করিয়াছি। মনে হইল, তাহার তীব্র মানসিক যন্ত্রণা যখন তাহাকে এইরূপে নাকাল করিতেছে তখন তাহার হয় মুক্তি ঘটিবে, না হয় মৃত্যু। আমি তাহাকে কী করিয়া ঠেকাইব ? অশক্ত, বৃদ্ধ এই আমি তাহার জন্মদাতা বটে, কিন্তু আমার সৃষ্টি তো সে নহে।

"সে যাহার সৃষ্টি, সে প্রকৃতপক্ষে যাহার সন্তান, আজ আমি তাহাকেই সমস্ত হৃদয় দিয়া স্মরণ করিয়াছি। বারংবার বলিয়াছি, আজ আমার কনিষ্ঠ পুত্র সেই উপলব্ধিতে উপনীত হউক যাহা তাহাকে আপনার সহিত বিশ্বব্যাপী প্রাণের তরঙ্গের সম্পর্কটি আবিষ্কার করিতে সাহায্য করে।

"পরম পিতা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমার কনিষ্ঠ পুত্রের মুখে আজ এক আনন্দের আলো খেলা করিতেছে। বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, সে এইখানেই থামিবে না। সে খুঁজিবে। যাঁহার কাছে বিশ্ব-রহস্যের চাবিকাঠি রহিয়াছে তাহাকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবে।

"আজ আনন্দ আমারও। বুড়া হইয়াছি বটে, কিন্তু মনে হয় অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে তো জরা স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা জন্ম-মৃত্যুর অর্গল ভাঙিয়াই প্রবহমান। খণ্ডিত দৃষ্টিতে তাহা ধরা যায় না।

"আমার পুত্র যদি পায় ভাল, পৌত্র যদি পায় ভাল, না হইলে পৌত্র প্রপৌত্র বংশানুক্রমে কেহ কখনও পাইবেই তাঁহাকে। যদি পায় তাহা হইলে আমরা বিগত হইয়াও উদ্ভাসিত হইব। পূর্ণ হইব।

"আজ আমার বক্ষদেশ আশায় আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। এত আনন্দ আর তো কখনও পাই নাই।"

★ ★ ★

তুমি কি জানো যে, আমি খুব খারাপ মেয়ে নই ?

জানি।

আমাকে কি তুমি ঘেন্না করো ?

না।

আমাকে কি তোমার খুন করতে ইচ্ছে হয় ?

সে কি ? এসব কথা কেন ?

জেনে রাখা ভাল। যদি খুন করতে ইচ্ছে হয় তো বোলো। আমি সরে যাবো।

খুন ! তুমি কী যে বলো !

দেখ, তোমার মুখচোখ দেখে আজকাল তোমাকে অন্যরকম মানুষ বলে মনে হয়।

কিরকম ?

আগে তোমাকে এত কনফিডেন্ট আর ধীরস্থির দেখতাম না। আজকাল তোমার মধ্যে বেশ একটা সুস্থির ভাব এসেছে। মনে হচ্ছে তুমি মনে মনে একটা কোনও প্ল্যান এঁটে ফেলেছো। তোমার প্রবলেমটা কী তা আমি জানি। আমিই তোমার সবচেয়ে বড় প্রবলেম। আমাকে সরাতে পারলেই তুমি ফ্রি অ্যান্ড হ্যাপী। তাই না ?

অন্বেষা এসব কথা বলছিল রবিবারের সকালে। বিছানায় শুয়েই। আজ তারা দুজনেই দেরী করে উঠবে। এখন মোটে সাতটা বাজছে। একটু শীতের রেশ এখনও আছে। দুজনেরই গায়ে চাদর। দু' বিছানায় দু'জন।

বিমল অন্বেষার কঠিন সুন্দর মুখখানা নাইলনের মশারির ভিতরে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। ভাগ্য ভাল, চোখ দিয়ে শুধু মুখটুকুই দেখা যায়, মন দেখা যায় না। পৃথিবীতে এইসব আছে বলেই এখনও এই গ্রহ বাসযোগ্য। যদি মানুষের মুখ দেখে মনটাকেও আঁচ করা যেত তাহলে কী কেলেংকারীই হতে পারত।

কী ভাবছো ?

কিছু না।

যা ভাবছো তা কিন্তু কাজে করতে যেও না।

কী ভাবছি তা টের পেলে কী করে ?

আমার মনে হয় তুমি আমাকে সন্দেহ করো।

মোটেই না অনু। সন্দেহ করব কেন ?

একদিন আমি মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম যে, সেক্স-এর ব্যাপারে আমি আমার পথ খুঁজে নেবো।

তাতে আমি কিছু মনে করিনি।

কেন করোনি ?

আমি তো পুরুষ হিসেবে ব্যর্থ।

তুমি তো আমাকে অনুমতিও দাওনি।

অনুমতি ! এসব আবার কেউ অনুমতি নিয়ে করে নাকি অনু ?

শোনো, আমি খারাপ মেয়ে নই। আমাকে সন্দেহ কোরো না।

করছি না।

আর একটা কথা।

কী কথা ?

আমাকে এই সেট আপ-এ আর কতকাল থাকতে হবে ? একটা ছোট্ট বাসায়, এতগুলো লোক। সবাই তোমার আর আমার ওপর ডিপেণ্ডেন্ট। এটা তো দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

ওরা তো কোনওরকমে আছে। জাস্ট লাইক পেটস্।

মোটেই নয়। তোমার নিজের জন বলে ওরকম ভাবছো। তোমার মায়ের জিবের ধার তো জানো। তোমার বাবা একটি চীজ। ভাই আর বোনের কথা না বলাই ভাল। আমি এভাবে থাকতে পারব না।

ফ্ল্যাট নেওয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু অনেক টাকা লাগবে।

সময় থাকতে কিছু কবলে না। এখন দাম হুহু করে বেড়ে গেছে। যাই হোক, যদি ফ্ল্যাট নাও কেনা যায় তবে আমি অন্য ফ্ল্যাটে চলে যাবো।

প্লীজ অনু, আমরা ওদের ডিচ করলে ওরা সবাই না খেয়ে মরবে।

মরবে না। মানুষ অত সহজে মরে না। বরং আলসেমি ঝেড়ে কাজ করতে নামবে। জোজো কি পারে না কিছু করতে ? সব দায় কি তোমার ?

জোজো তো চাকরি ভাল করে না।

কিন্তু আমারও তো ফ্রিডম চাই।

সবই বুঝি অনু, আর কিছুদিন সময় দাও।

সময় চাইছো, কিন্তু আমার তো ভয় হচ্ছে তোমার বড় বোনটিও না আবার আমাদের ঘাড়ে এসে চাপে।

দেয়া ? সে কেন আমাদের ঘাড়ে চাপবে ?

ওর বরের বোধহয় ক্যানসার। জানো না ?

ক্যানসার ! বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বিমল।

কাজেই বলছি, কোনও ঘটনা ঘটবার আগেই আমাদের সেপারেট হওয়া ভাল।

বিমল বালিশে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল, তুমি যা চাও তাই তো বরাবর হয় অনু। এটাও হবে।

আমি খারাপ ভেবে বলছি না। সকলের ভালর জন্যই।

জানি।

ছেলেটার কথাও তো ভাবা দরকার। ওরও তো ভবিষ্যৎ আছে।

আমি ভেবে দেখব।

তোমাকে অত ভাবতে হবে না। একজন প্রোমোটারের সঙ্গে আমার চেনা আছে। লোকটা আমার হাতের মুঠোতেই আছে। সস্তায় ফ্ল্যাট দেবে বলে কথা দিয়েছে। সি আই টি-তে।

কথা হয়ে গেছে?

প্রিলিমিনারি। লাখ দেড়েক টাকা পড়বে সব নিয়ে।

দেড় লাখ!

ভয় পাচ্ছো কেন? শুনতে দেড় লাখ কিন্তু টাকার ভ্যালুয়েশন এখন আর কী বলো! তাছাড়া যে ফ্ল্যাট আমরা দেড় লাখে পাবো তা অন্যরা কিনছে তিন সাড়ে তিন-এ। সবচেয়ে বড় কথা টাকা একসঙ্গে দিতে হবে না।

কত দিনে?

দু' পাঁচ বছর সময় পাওয়া যাবে।

বেশ তো।

রাজি?

রাজি।

দেখো, সেপারেট হলে তোমার আর আমার সম্পর্কেরও অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হবে।

হুঁ।

হুঁ মানে কি? তুমি কি বিশ্বাস করো না কথাটা?

করছি।

দেখেছো তো, আজকাল আমার রাগ কত কমে গেছে!

দেখছি।

অনু হঠাৎ একটু মাথা তুলে বলল, তোমার কী হয়েছে একটু বলবে আমাকে? গোপনে প্রেমট্রেম করছো নাকি?

বিমল ম্লান হাসল। বলল, না। প্রেম কি অত সহজ?

প্রেম তো সহজই। আজকাল একদম সহজ।

আমার কাছে নয়।

অন্বেষা মুখখানা তোম্বা করে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কিছু না হয়ে থাকলেই ভাল।

কিছু হয়নি অনু।

অন্বেষা একটা হাই তুলল। তারপর ফের বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল। একটা অবৈধ মিলনের স্মৃতি চোখ বুজতেই চলে এল। আর সেই উত্তেজক স্মৃতি তার সমস্ত শরীর জুড়ে এক কবোষ্ণ শিহরণ তুলে গেল।

মুখ দেখে কি মনকে একদমই বোঝা যায় না! বিমল কিন্তু এখন দুই তীক্ষ্ণ চোখে অন্বেষার মুখে কিছু একটা খুঁজে পেল। বিমল জানে, অন্বেষা পরপুরুষগমন করছে। কিভাবে জানে তা সে বলতে পারবে না। কিন্তু সেই উন্মত্ত রাগী খ্যাপাটে অনু এক মন্ত্রপড়া সাপের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এটা ওই ব্যভিচারেরই ফল।

তা হোক। বিমলের কিছুই হাবায়নি। সে শক্তসমর্থ পুরুষ। শুধু অনুর কাছেই সে কেমন অসহায়, ভীত, আত্মবিশ্বাসহীন। এতকাল এক অসহনীয় মানসিক কষ্ট সে ভোগ করছিল। আজ স্ত্রীর ব্যভিচারের ভিতর দিয়ে সে একরকম মুক্তি পেয়েছে। একটুও হিংসে হয় না তার। একটুও রাগ হয় না।

বিমল উঠল। অনু দ্বিতীয় দফা ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক।

অনেকদিন বাদে বিমল আজ কালীকিংকরের ঘরে হানা দিল।

বাবা, কেমন আছ?

কালীকিংকর সবিস্ময়ে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ভাল রে ভাল। তোর শরীর কেমন?

ভালই বাবা। মা কোথায় বলো তো!

রান্নাঘরে বোধহয়।

দাঁড়াও, সবাইকে ডাকি।

ডাকবি? কেন?

একসঙ্গে সবাইকে দেখিনি অনেকদিন।

তা বটে। তবে ডাক।

বিমল ডেকে আনল সবাইকে।

সকলেই কিছু অবাক, কিছু বিব্রত, কিছু ভীত। বিমল তাদের ডেকে কী বলবে? খারাপ কিছু?

বাবা, মা, তোমরা বোসো। তোরাও বোস জোজো, কেয়া।

কালীকিংকরের ছোটো ঘরটা ভরে গেল পাঁচজনে।

তোমাদের সবাইকে একটা কথা আজ বলতে চাই। অনু সেপারেট হতে চাইছে।

জোজো বলল, তার মানে? তোর সঙ্গে, না আমাদের সঙ্গে?

বিমল হাসল, ডিভোর্স নয়। ও চাইছে আমরা সেপারেট একটা এস্টাব্লিশমেন্ট করি।

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু অবাক হল না। এরকম তো আন্দাজ করাই গিয়েছিল।

কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম তোমাদের ছেড়ে আমি চলে গেলে তোমরা খুব বিপদে পড়বে।

কালীকিংকর বললেন, তাহলে?

তাহলে পথ একটাই। অনু যাচ্ছে, যাক।

কালীকিংকর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তুই বউমাকে ত্যাগ করতে চাস?

না। সে চাইছে।

সে কি তোকে ত্যাগ করতে চেয়েছে?

না, কিন্তু সে আলাদা হতে চেয়েছে।

কালীকিংকর সংসারের কোনও ব্যাপারেই কোনও মতামত দেন না, কিন্তু আজ দিলেন। বললেন, তাতে তার দোষটা কোথায়? এই সংসারের যা পরিস্থিতি তাতে যে বউমা এতকাল আমাদের সঙ্গে থেকেছে সেইটেই তার মহত্ত্ব।

সুরভি ঝংকার দিয়ে উঠলেন, আহা, কী দয়ার শরীব! বলতে তোমার মুখে আটকাল না? বিমল বলছে ওকেই বলতে দাও, মাঝখানে কথা তুলে ব্যাপারটা গুলিয়ে দিও না।

কালীকিংকব স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ধীর স্বরে বললেন, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ককে তুমি কী চোখে দেখ তা এতকাল পরেও আমি জানতে পারিনি। কিন্তু আমার মনে হয়, সম্পর্কটা খুব সাধাবণ নয়। এটা নিয়ে ছেলেখেলা করা মানে সর্বনাশ ডেকে আনা।

বিমল একটু অবাক হয়ে বলে, তোমরা তো ওকে জানো। আমাদের জীবনটা যে এরকম বিষময় হয়ে গেল তার জন্য এ বাড়িতে একজন দায়ী। সে অনু। জন্য তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আলগা হয়ে গেছে, আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, সারাদিন টেনশনে ভুগি। এই তো কয়েকদিন আগেও বাবাকে নোংরা

ভাষায় ও কিরকম অপমান করেছে।

সুরভি জয়ের গন্ধ পাচ্ছিলেন। ছেলে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, সে আবার হাতের মুঠোয় ফিরে আসছে। এ সুযোগ সুরভি ছাড়েন কি করে? তিনি বললেন, ওঁর কথা বাদ দে তো। বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে। বউমা কি সোজা লোক নাকি? দিনরাত্তির দেখছি তো।

জোজো আর কেয়া কোনও কথা বলতে পারছিল না।

কালীকিংকর মাথা নেড়ে বললেন, আজ বিমল যা বলছে তাতে আমি খুশি হতে পারছি না, তুমি হয়তো হয়েছো। পুত্রস্নেহে অন্ধ মায়েরা এরকমই চাইবে, সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমার মনে হয়, বউমার সঙ্গে বিমলের একটা অবনিবনা ঘটছে, তার কারণ ওদের ব্যক্তিগত। মা-বাপ ভাই-বোনের কথা ভেবে বিমল এরকম সিদ্ধান্ত নেয়নি।

বিমল মিইয়ে গেল। মৃদু স্বরে বলল, কথাটা মিথ্যে নয় বাবা, আই হ্যাভ, উই হ্যাভ আওয়ার ওন প্রবলেমস। কিন্তু সিদ্ধান্তটা খারাপ হবে কেন? যদি ধরো আমরা ডিভোর্সই করি!

একথায় সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

কালীকিংকর সেই স্তব্ধতা ভেঙে বললেন, তাহলে বলব তুমি কুলাঙ্গার।

কেন বাবা?

তুমি কাপুরুষের মতো কাজ করতে চলেছো। বউমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল থাকলে তুমি বউমার সঙ্গে আলাদা হওয়ার কথা ভাবতে না, তুমি সস্ত্রীক আমাদের ত্যাগ করে যেতে। আজ তোমার সে উপায় নেই বলে ওকে ত্যাগ করে বাঁচতে চাইছো।

তাহলে কী করা উচিত?

সমস্ত ব্যাপারগুলো আমি তো জানি না। কী বলব? যদি পারো তবে নির্জনে কোথাও গিয়ে বসে নিজের দোষত্রুটিগুলো খতিয়ে দেখ গে। কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিও না। কাউকেই ত্যাগ না করে যদি সংসারে চলতে শেখো তাহলেই বলব পুরুষমানুষ।

কিন্তু ও যে—

থেমে গেল বিমল। কালীকিংকর তাঁর দুই দীপ্তিহীন চোখে আগুন জ্বেলে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, বলো।

বলা যায় না।

কালীকিংকর বললেন, তাহলে বোলো না। তবে যাই তোমাদের মধ্যে ঘটে থাকুক, কোনও মানুষই এখনও অবধি পচে যায়নি, নষ্ট পায়নি। বউমার ভুলত্রুটি

থাকতে পারে, সে আমাদের সকলের আছে। স্বামী আদর্শনিষ্ঠ হলে বউ কি নষ্ট পেতে পারে?

তুমি এমনভাবে বলছ যেন দোষটা আমারই।

কালীকিংকর মাথা নেড়ে বললেন, দোষ আমাদেরও। বিশেষ করে আমার। সন্তানেরা যদি অসুখী হয়, বিকৃত স্বভাবের হয় তবে তার দায় মা-বাপেতেও অর্শায়। তোমরা জন্মাবধি তোমাদের মা-বাপকে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে দেখনি, তাই তোমাদের মধ্যেও নানা গোলযোগ ঢুকে গেছে।

সুরভি রুখে উঠে বললেন, তার জন্য কে দায়ী? আমি, না তুমি?

কালীকিংকর ঝগড়ায় গেলেন না, ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি। আমি ছাড়া আর কেউ নয়। আজকাল সারাদিন নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো নিয়ে ভাবি আর সব ধরা পড়ে। তোমাকে বলি, আমরা যে বিদ্বিষ্ট হয়েও পরস্পরকে নিয়ে এতকাল সংসার করেছি সেটা সম্ভব হল কী করে? কই, তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে ত্যাগ করার কথা ভাবিনি তো? আর ত্যাগ করে লাভই বা কী? স্বভাবে গাঁট থাকলে দশবার বউ বা স্বামী বদলেও লাভ হয় না।

সুরভি বললেন, ত্যাগ না করলেও একরকম ত্যাগেই থেকেছি আমরা। একে কি ঘর করা বলে? এ হল শিবের সংসার।

কালীকিংকর গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজে বললেন, সবই জানি। আমার দোষঘাট আজ মাপ করে দাও। ওদের দিকে তাকাও। আমাদের পাপে ওরা শাস্তি পাচ্ছে। আমরা ওদের যেভাবে তৈরি করেছি, ওদের যে পরিবেশে বড় করেছি, তা ওদের ভাল করেনি। আজ আর এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিও না যাতে ওরা বেঁচে থেকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে। আমার ছেলেরা মেয়েরা বড় কষ্ট পাচ্ছে।

সুরভি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, জোজো বলল, মা! তুমি এসব কথার মধ্যে থেকো না। বাবা যা বলছে শোনো।

তুই কেন ফোড়ন কাটছিস এর মধ্যে? সংসারের তুই বুঝিস কী?

তেমন কিছু বুঝি না। কিন্তু বাবার কথা আমার ইল্‌লজিক্যাল মনে হচ্ছে না। বউদি যেমনই হোক, তাকে আলাদা করে দেওয়াটা দাদার পক্ষে একটা ডিফিট হবে।

তাহলে কী করবি? রোজ ওই দজ্জাল মাগীর পা-ধোয়া জল খাবি?

না, কিন্তু শুধু ওর ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দেবো না। ইন ফ্যাক্ট, একই বাড়ির একই ছাদের তলায় থেকেও আমরা তো হাজার মাইল তফাতে আছি পরস্পরের কাছ থেকে। কেউ কারও মনের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করি না, কেন

কে কিরকম ব্যবহার করছে তাও ভাবি না।

তোরা ভাব গে। আমার দরকার নেই।

সুরভি রাগ করে উঠে গেলেন।

কালীকিংকর পিছন থেকে ডাকলেন, শোনো।

সুরভি দরজার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আবার কী ? তোমাদের রায় তো জানা হয়েই গেল।

তোমার গোপুর কথা কি ভেবেছো একবারও ?

দিনরাতই ভাবি। কেন ?

বউমা চলে গেলে গোপুও যাবে।

কিছুতেই না। গোপুকে রেখে দেবো।

যদি রেখেও দাও তাহলেই কি ভাল হবে ? গোপু তো তার মাকেও ভালবাসে। ওকে এই বয়সে মা-ছাড়া করবে ?

আহা মরে যাই,মা না ডাইনী ! ওরকম মায়ের খপ্পড় থেকে বের করে আনলে ছেলেটা বাঁচবে।

তুমি কি মা নও ? মা কেমন হয় জানো না ?

জানি, খুব জানি। আমরাও মা আর ও-ও মা, কার সঙ্গে কার তুলনা !

বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, মায়ের খুব একটা রকমফের নেই। গোপুকে গোপনে ডেকে জিজ্ঞেস করো। বুঝতে পারবে।

তোমার দরকার থাকলে তুমি জিজ্ঞেস করো। আমার তত্ত্বকথা মাথায় ঢোকে না।

সুরভি চলে যাওয়ার পর ঘরে নীরবতা নামল।

কালীকিংকর কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইলেন। তারপর চোখ তুলে বললেন, অনেককাল নির্জীব হয়ে ছিলাম। আজ প্রতিবাদ না করে পারলাম না। তোমরা কিছু মনে করো না। পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে একবার যেন ভাবতে পারি, জীবনটা সুন্দর ছিল, তাকে হতশ্রী করেছি নিজের কর্মদোষে।

জোজো বলল, ও কথা বলছো কেন বাবা ? তোমার দোষ কী ?

কালীকিংকর মৃদুস্বরে বললেন, আছে। আমার নিজের বাবা খুব তেজস্বী মানুষ ছিলেন। স্ত্রৈণ ছিলেন না, অত্যাচারীও ছিলেন না। কিন্তু আদর্শবান ছিলেন। আমার মা তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। আমার কাছেও আমার বাবাই ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর কথা যত ভাবি ততই নিজের ওপর ঘৃণা আর রাগ হয়। শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেমন হয় জানো ? স্নেহময়, ক্ষমাশীল, আদর্শবান, পরোপকারী, স্বার্থহীন, দৃঢ়চেতা, সাহসী, অকপট, বিকৃতিহীন ; তাঁর

ছেলে হয়েও আমি কেন যে এত দুর্বল আর ভীরু হয়েছি কে জানে!

বিমল চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ বলল, তুমি যা বলছ বাবা, তোমার বউমা সম্পর্কে যদি সব জানতে তাহলে বলতে না।

তোমার যদি আমাকে সব অকপটে বলতে বাধা না থাকে তো বোলো। ভেবে দেখব।

বিমল মাথা নাড়ল, বলা যাবে না। তবে তোমার বউমার এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, আমি তাকে খুন করার প্ল্যান আঁটছি।

কালীকিংকর হঠাৎ উদাসীনভাবে বললেন, অসম্ভব কি? খুন আজকাল আকছার হচ্ছে।

তার মানে, তুমি বলতে চাও খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব?

কালীকিংকরের স্তিমিত চোখে ফের একটু ফুলকি দেখা গেল। বললেন, ছেলেবেলায় আমি একটা বেড়ালছানা মেরেছিলাম। ইচ্ছে করে নয়, সেটাকে তাড়াতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম মাত্র। আজও সেই স্মৃতি আমাকে তাড়া করে। তুমি হয়তো সরাসরি খুন করবে না, কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারো যা তোমার স্ত্রীকে মরতে প্ররোচিত করে। আর মানুষ অনেক সময়েই তার অপছন্দের মানুষটির মৃত্যু মনে মনে কামনা করে। বাইরে আমাদের যত ভদ্র আর নিরীহ দেখায়, মনে মনে আমরা সেরকম মোটেই নই!

কী যে তুমি বলো বাবা!

একটু ভেবে দেখ, অকপটে আত্মসমালোচনা করো, দেখতে পাবে এই কথার মধ্যে একটু সত্যতা আছে। তোমার হাবভাবে বউমা এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যা তার পক্ষে অস্বস্তিকর।

তুমি যে কেন আজ এত ওর পক্ষ নিচ্ছ!

নিচ্ছি না। আজ এমন একটা বয়স এবং মানসিকতায় পৌঁছে গেছি যে আমার আর পক্ষপাত নেই। আমি সারাদিন মনে মনে বিচার করি। আমার মনে হয় তুমি বউমার দোষ নিয়ে মাথা ঘামাও। দোষ দর্শন ভাল নয়।

দোষ থাকলেও দোষ দেখব না?

অন্যের দোষ তোমার চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের দোষ নয়। তাই না? মনে রেখো, মানুষ যখন অন্যের দোষ দেখতে শুরু করে তখন সেইসব দোষ তার নিজের ভিতরে এসে বাসা করে। পরনিন্দা করা মানেই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া।

তুমি সব জানো না বাবা।

জানি। তুমি যেমন বলতে পারছো না, আমিও তেমনি কথাটা বলতে পারছি

না। আমাব চোখে সেই দৃষ্টি নেই, তবু আমিও কিছু কিছু দেখি। তুমি বউমার যে দোষটার কথা বলতে চাইছো তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, যে দোষের জন্য তোমারও অর্ধেক দায়ভাগ আছে।

বাবা!

আরও একটু শোনো। বউমাকে পরিত্যাগ কবলেও তোমার লাভ হবে না। বউমার যদি কলঙ্ক ঘটে থাকে, তোমারও ঘটতে চলেছে। প্রবৃত্তি তার রাস্তা করে নেবেই। সর্বনাশ ঘটবার আগেই আত্মস্থ হও। কলুষমুক্ত হও।

এসবই তো দার্শনিক কথা বাবা।

না। প্র্যাকটিক্যাল কথা। আমি বলি তুমি বউমাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে যাও। বেড়াতে নয়। আমি একটা জায়গার কথা জানি। একটি আশ্রম। কয়েকদিন গিয়ে দুজনে থেকে এসো। সদুপদেশ শোনো, সদাচাব দেখ, সৎকথা পড়ো। তোমাদের ধন্দ কেটে যাবে। জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। মানুয জন্মটা এত খাবাপ কিছু নয়, হালকা স্রোতে ভেসে গেলে জীবনটাকে উপলব্ধিই করতে পারবে না। একদিন যখন মরণ ঘনিয়ে আসবে তখন হায় হায় করতে করতে নানা অতৃপ্ত কামনা বাসনা বাগ বিদ্বেষ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে চোখ বুজতে হবে। যা বলছি শোনো। দেরী করো না। এখনও সময় আছে।

কোথায় যাবো?

আগে মনস্থির করো। আমি বলে দেবো।

যদি অনু যেতে না চায়?

সেও কি সুখে আছে? মোটেই নয়। সে যদি বাঁচবার পথ পায় তবে নিশ্চয়ই যাবে। দুজনে পরামর্শ করো আজ সারাদিন।

বিমল ম্লান মুখে উঠল। বলল, ঠিক আছে। অনেকদিন তুমি আমাকে কিছু করতে হুকুম করোনি। আজ যখন করছো তখন তোমার কথাটা শুনেই দেখি।

দেখ। কাউকে ত্যাগ করাটা আমি পাপ বলে মনে করি।

বিমল চলে গেল।

কেয়া আব জোজো বাপের দিকে চুপচাপ চেয়ে বসে রইল. কালীকিংকরেব এবকম ভূমিকা তারা বহুকাল দেখেনি। একটু অবাক তারা, একটু সপ্রশংস।

জোজো মৃদুস্বরে বলল, তোমার শরীর কেমন বাবা?

কালীকিংকর মৃদু হেসে বললেন, শরীরের খোঁজ নিস কেন রে? মনটা যদি আমার ভাল রাখিস শরীর ঠিক থাকবে। শরীর তখনই পাত হয় যখন মনটা নিবে যায়।

জোজো চিন্তিত মুখে উঠল। বেরিয়ে এসে দেখল, বউদি খাওয়ার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো।

চোখে চোখ পড়তেই জোজো হাসল, বউদি, গুড মর্নিং।

অনু হাসল না। মুখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু অনুর মুখে সেরকম কোনও বিরাগ বা তাচ্ছিল্য নেই। বরং মুখটাকে করুণ ও বিব্রত বলেই মনে হল জোজোর। একটা মানুষ হয়তো শতকরা একশো ভাগই খারাপ হতে পারে না।

জোজোর আলাদা কোনও ঘর নেই এ বাড়িতে। তাই সে গিয়ে সোজা মায়ের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আর একদফা ঘুমোনোর চেষ্টা করল।

সুরভি পূজো করতে বসেছিলেন। বললেন, তুই একটা বাসাটাসা দেখ তো।

কেন, বাসা কি হবে?

আমি তোদের নিয়ে আলাদা থাকব।

সে তো অনেকবার শুনেছি। রাগ হলেই বলো। তা ভাগাভাগিটা এবার কিরকম হবে? মনে হচ্ছে এবার বাবাকে নেবে না, তাই না?

ফাজলামি করবি না। তোর বাপের মাথার দোষ হয়েছে। অবশ্য বরাবরই ছিল।

ছিল? তাহলে লোকটাকে বিয়ে করতে গেলে কেন?

খুব ইয়ার্কি শিখেছিস দেখছি!

আহা, জবাবটা দাও না। বিয়ে করলে কেন?

তখন কি আর আমাদের পছন্দ অপছন্দের বালাই ছিল! পাগল হোক, ছাগল হোক যাকে ধরে এনে গলায় ঝুলিয়ে দেবে তার সঙ্গেই জীবনভোর থাকতে হবে।

কিন্তু এখন তো নিয়ম পাল্টে গেছে, তোমারও চোখ খুলেছে। বলো তো উকিল ঠিক করে দিই, ডিভোর্সের মামলা ঠুকে দাও।

মারব থাপ্পড়।

কেন, ডিভোর্সে দোষ কী?

ভাবাও পাপ, উচ্চারণ করে কত পাপের তলায় যে ফেললি আমাকে!

তাহলেই বোঝো যা উচ্চারণ করলে বা ভাবলে পাপ হয় তা নিজের ছেলেকে করতে বলাও তো পাপ।

আমি কি বিমলকে ডিভোর্স করতে বলেছি?

আলাদা করে দেওয়ার মানে তো তাই।

তুইও অনুর পক্ষে নিলি? হঠাৎ ওর মধ্যে কোন মধু পেলি তোরা বল তো!

শোনো মা, বউদি এ বাড়িতে কিন্তু একা, আর আমরা কিন্তু এককাট্টা, অন্তত

বউদির সঙ্গে শত্রুতায়। লড়াইটা খুব ফেয়ার নয়।

ওরে পাগল শোন, মেয়েরা যদি রোজগেরে স্বামীকে আঁচলে বাঁধতে পারে তাহলে আর শ্বশুরবাড়ির হাজার জন এককাট্টা হয়েও কিছু করতে পারে না। ও কি সোজা মেয়ে? বিমলকে তুক করে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল না?

তোমার বিমল যদি ভেড়া বনতে চায় তাহলে কে তাকে ঠেকাবে? আজ যে সে সিংহ সাজছে তাও উপায় নেই বলেই। তুমি মোটেই ভেবো না যে, দাদার হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে।

তাহলে কী?

দাদা বউদির হাত থেকে বাঁচার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। দরকার হলে হয়তো খুনও করবে।

তুই এসব কথা কেন বলছিস?

জানি বলেই বলছি। আমার বন্ধু বিজয় বউদিকে একটা নন-বেঙ্গলি ছেলের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে দেখেছে। ছেলেটা জিমির দাদা জনি।

জিমি! সে তো খুব ভাল ছেলে।

সেও ভাল, জনিও ভাল, বউদিও ভাল, দাদাও ভাল। খারাপ শুধু আমাদের কপাল। এখন ঘুমোতে দাও।

আজ সুরভির পূজো আর শেষ হল না।

বিমল যখন ঘরে এল অন্বেষা তখন বাথরুম বা অন্য কোথাও। একা গোপু শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটা খুব ঘুমোয়। বড্ড দুর্বল। বড্ড মনমরা।

ছেলেটার দিকে খনিকক্ষণ চেয়ে রইল বিমল। অন্বেষাকে জীবন থেকে বাদ দিলেও তেমন কোনও অভাব বোধ করবে না বিমল। কিন্তু এই যে তার ছেলে, একে বাদ দেওয়া তো সম্ভব নয়। অন্বেষা যদি যায় তাহলে কি আর গোপুকে ফেলে রেখে যাবে?

বেলা যথেষ্ট হয়েছে। বিমল প্যান্ট শার্ট পরে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বাইরে কোনও একটা নিরিবিলি চায়ের দোকানে বসে চুপচাপ পরিস্থিতিটা ভাববে।

বেরোবার মুখেই অন্বেষা ঘরে ঢুকল। মুখটা এখনও ভেজা, চুল উড়োঝুরো এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা চোখের দৃষ্টি ধারহীন, ভীত।

শোনো! কোথায় যাচ্ছো?

বাইরে।

তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন করার আছে।

কী প্রশ্ন ?

একটু আগে তোমার বাবার ঘরে তোমাদের একটা মিটিং বসেছিল।

হ্যাঁ।

আমাকে নিয়ে তোমরা আলোচনা করছিলে।

হ্যাঁ। তুমি বোধহয় আড়ি পেতে শুনেছো।

অন্বেষা মাথা নেড়ে বলল, আড়ি পাততে হয়নি। তোমরা তো বেশ চেঁচিয়েই কথা বলছিলে।

তা বটে। আমাদেরও গোপন করার মতো কিছু ছিল না।

সকালবেলা তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা হয়েছিল। আমি প্রস্তাব করেছিলাম আলাদা হওয়ার। তুমিও রাজি ছিলে।

বিমল সামান্য ভ্রূ কুঁচকে বলল, তুমি গত কয়েক বছর ধরে যা বলেছো আমি তার সব কটাই মেনে নিয়েছি। তোমার সব কথা মেনে নেওয়ার মানে এ নয় যে, তাতে আমার মন বা বিচারবুদ্ধি সায় দিয়েছে। অশান্তির ভয়ে, তোমার ভয়ে, আমাকে সবই মেনে নিতে হয়েছে। আজও সকাল অবধি তুমি খুব ভার হয়ে ছিলে আমার মনে। তোমাকে আমি ভয় পাই অনু। ভীষণ ভয় পাই। কিন্তু এত ভয় নিয়ে তো বেঁচে থাকা যায় না। লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বলে। কিন্তু স্ত্রৈণ মানে যদি ভালবাসার স্ত্রৈণ হয় তো সে একরকম। আমি স্ত্রৈণ ভয়ে।

অন্বেষা এক মরা চোখে চেয়ে ছিল বিমলের দিকে। কেমন একটা হতাশার স্বরে বলল, তুমি স্ত্রৈণ হলে কি আমার খুব সুখ ?

কে জানে! আমাকে মানুষ বলে তো কোনওকালে গণ্য করোনি। তোমার দাপটে আমিও নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে ভুলে গিয়েছিলাম।

তুমি শুধু আমার দাপটটাই দেখলে। আমারও যে তোমার কাছে কিছু পাওনা ছিল তা তো দেখলে না।

বিমল রেগে গেল না। ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, একটা গাছ লাগাও বা একটা কুকুর পোষো, তার কাছ থেকে কিছু পেতে হলে তাকেও কিছু দিতে হয়। গাছে জল দাও না ? কুকুরকে ভাত দাও না ? তেমনি আমাকেও তুমি একটু আত্মবিশ্বাস আর সাহস দিতে পারতে। আমার সত্তাটাকেই ভেঙে দিলে, তোমার অ্যাগ্রেসিভনেসে আমি যেন কিরকম হয়ে গেলাম। বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ভিতরের সব রসকষ মরে যেতে লাগল, বউ হয়েও তুমি হয়ে গেলে জুজুবুড়ির মতো। যতক্ষণ ঘরে থাকতে হয় ততক্ষণ বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে। হার্টের অসুখ হয়ে যাওয়ার কথা এতদিনে।

আজ বোধহয় তোমার দিন এল।

বিমল হাসল, এখানে বাড়ির লোকজনের মধ্যে তবু আমি খানিকটা সেফ। কিন্তু তোমার সঙ্গে একা এক বাসায় থাকার কথা ভাবতে আমার বুক হিম হয়ে যায়।

আমি যে এত ভয়ংকর তা তো জানতুম না।

শুধু তুমিই ভয়ংকর নও, আজ আমাকেও তুমি ভয় পেতে শুরু করেছো। কেন তা ভাল করে জানি না। মনে হচ্ছে তুমি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে···

অন্বেষা মাথা নত করল। বিমল কথাটা শেষ করতে পারল না। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা অকারণে মুছতে মুছতে চাপা গলায় বলল, এবং···এবং···আমি তাতে খানিকটা রিলিফ ফিল করছি। যাক, আমার বউ আর অন্তত শরীরের জন্য আমাকে জ্বালাতন করবে না। এটাকে কি তুমি স্বাভাবিক মনে করো?

অন্বেষা কথাটার জবাব দিল না। মুখও তুলল না। তবে খুবই ক্ষীণ স্বরে বলল, তোমাদের মিটিঙে কী ঠিক হল? আমার নির্বাসন?

না। বাবা তোমার পক্ষ নিয়েছেন। পুরোনো আমলের লোকদের মূল্যবোধ অন্য রকম। উনি বরং আমার ওপরেই দোষারোপ করছেন।

অন্বেষা পথ আটকে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজায় ছিটকানি তুলে পাল্লায় পিঠ দিয়ে বলল, আমার দু একটা কথা আছে। বলব?

বলো। লেট আস ক্লিয়ার আওয়ার সিচুয়েশন।

শ্বশুরমশাইয়ের সব কথাই আমি শুনেছি। আমি ওঁকে কোনোদিন ভাল করে লক্ষ্যই করিনি, ইনসিগ্নিফিক্যান্ট বলে পাত্তাও দিইনি। কিন্তু আজ ওঁর কথা শুনে আমি ভীষণ ইমোশন্যালি আপসেট। আমি ঘর ভাঙতে চাই না।

তার মানে?

লেট আস ট্রাই এগেন।

বাবার সাজেশন শুনেছো?

শুনেছি। আমি যেতে রাজি। চলো, ওরকম কোনও ভাল জায়গায় কয়েকদিন গিয়ে থাকি। কে জানে হয়তো আমাদের দুজনেরই ভয় কেটে যাবে।

বিমল খুব ধীরে ধীরে লম্বা একটা শ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, ঠিক আছে, পথ ছাড়ো। আমি একটু ঘুরে আসি।

অন্বেষা পথ ছেড়ে দিল। বলল, কোথায় যাবে?

ঠিক নেই। মাথাটা ভার হয়ে আছে, একটু ঘুরে আসি।

একটা কথা বলব?

বলো।

একবার সম্বুদ্ধর কাছে যাও।

সম্বুদ্ধ?

বেচারা খুব কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তারদের সন্দেহ ক্যানসার।

জানি তো। সকালে তুমিই বলছিলে। ভয় পাচ্ছিলে দেয়া বিধবা হয়ে এসে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে।

বলেছি। তার জন্য ক্ষমা চাইছি। একটু দাঁড়াবে? আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে একটু যেতুম।

বিমল ফের একটা শ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, আমি বাইরের ঘরে গিয়ে বসছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

কালীকিংকর তাঁর ঘরে চুপ করে বসে ছিলেন। আজ তাঁর মনটা কিছু ভাবহীন। বহুকাল বাদে এই সংসারে তিনি কর্তার ভূমিকা পালন করলেন। ফল কী হবে তা তিনি জানেন না। কিন্তু নিজের দায়িত্বটা পালন করার দরকার ছিল।

এটুকু যে করতে পেরেছেন তাই যথেষ্ট।

আচমকা দরজায় সুরভি দেখা দিলেন। বিবস গলায় বললেন, খুব হল। দেবাদেবী দিব্যি হাসি-হাসি মুখ করে বেরিয়ে গেল।

দেবাদেবী আবার কে?

বিমল আর বউমা। ছেলেটার মতিগতি ফিরছিল, দিলে তাকে ফের বিগড়ে।

কালীকিংকর একটু হাসলেন, আর কতকাল বাঁচব আমরা বলো তো? এখনও যদি সংসারের পলিটিকস করে যেতে হয় তাহলে আর উচ্চ চিন্তা করবে কবে? খুব তো মালা টপকাও, মনে কখনও ভগবানের বাতাস এসে লাগে না?

ভগবান বুঝি হাতপাখা নিয়ে বসে থাকেন?

তা না থাকলে আর ভগবান কিসের? যে জুড়োতে চায় তাকেই জুড়োন। তুমি তো জুড়োতে ভালবাসো না, তাই তাঁর হাতপাখা নড়ে না!

মরণ! জুড়োতে তুমিই দিলে নাকি? বুড়োবয়সে সেই বউ আর ছেলের তাঁবেদারি করতেই দিন কেটে যাবে তাহলে। বেশ করলে যা হোক। দু কান কাটা না হলে কেউ ওই বউয়ের পক্ষ নেয়?

কালীকিংকর উঠলেন। বললেন, বাজারের থলিটলি যা হোক দাও। একটু ঘুরে আসি।

পালাচ্ছো? চিরটাকাল তো পালিয়েই কাটল।

কালীকিংকর মাথা নেড়ে বললেন, পালাবো কোথায়? পিছনে দেওয়াল। ঠেকে গেছি। তবে কি জানো, আমাকে খুব একটা মরণেও পায়নি। বাঁচতে যদি

হয় আরও কয়েক বছর তো বেশ ডগমগো হয়েই বাঁচব। সবাইকে নিয়েই।

থলি বারান্দার রেলিঙে গোঁজা আছে। নিয়ে যাও। কথা বললেই বিপত্তি।

ঘুমচোখে গোপু টলতে টলতে এসে ঠাকুমার আঁচল ধরে দাঁড়াল, ঠানু, মা কোথায় ?

কালীকিংকর একটু হেসে বললেন, শুনছো ? ভাল করে শোনো। এ প্রশ্নটার জবাব তোমাকে অনেকদিন ধরে দিতে হবে। যাতে ওর কাছে গ্রহণযোগ্য একটা জবাব দিতে পারো তার জন্য তৈরি থেকো।

সুরভি গোপুকে কোলে তুলে নিয়ে কলঘরের দিকে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এখন দয়া করে বাজারে যাও তো। সর্বনাশা পুরুষ। কোনকালে একটু শান্তি দিল না।

কিন্তু কালীকিংকর ওই কণ্ঠস্বর চেনেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, সুরভির গলায় তেমন ঝাঁঝ নেই, রাগ নেই, বিষ নেই। এই কটূ মন্তব্যের পিছনে বরং একটু স্বস্তিই আছে। প্রকাশটা বক্র, এই যা।

কালীকিংকর বাইরে বেরিয়ে টুকটুক করে হাঁটতে লাগলেন বাজারের দিকে। এখনও গতি আছে, এখনও স্পন্দন আছে, এখনও বোধশক্তি আছে। এখনও আছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এক অফুরান সম্পর্ক। বেঁচে থাকা এখনও স্বাদু লাগে কালীকিংকরের। ছেদহীন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

কালীকিংকর জমজমাট বাজারের মাঝমধ্যিখানে একটু দাঁড়ালেন। মিলিত হট্টরোল, একটা হলহলাশব্দ মন্থন করে দিচ্ছে চারপাশ। কত কটূ গন্ধ যে মিশে আছে বাতাসে। কিন্তু এই জমজমাট সকালের বাজার এত জীয়ন্ত, এত জঙ্গম যে কালীকিংকর চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

জীবনে কোনও কিছুর কাছেই হার স্বীকার করতে নেই। হারতে হয় তো হারবেন। কিন্তু চেষ্টা রাখতে হয়। চেষ্টা ছাড়তে নেই।

দুয়ার খুলে

আরে, আপনি ! দাদা তো বাড়িতে নেই।

বিজয়কে একটা খবর দিতে এসেছিলাম। ব্যাংক অফ বরোদা ওর প্রজেক্টকে ফিনান্স করবে।

তিথি উজ্জ্বল হয়ে উঠে বলল, কে রাজি করাল, আপনি ?

আমি নিমিত্ত মাত্র।

তার মানে ?

লোকে টাকা দেওয়ার জন্য বসেই আছে, তাকে খুঁজে বের করাটাই যা কষ্ট। যাক গে, কথাটা বলে দেবেন।

বাব্বা, দাদাটা আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোবে। কদিন তো ঘুম-টুমও নেই, খায় না, দায় না। সাইট পছন্দ করে এসেছে, কাকে কাকে নেবে তাও ঠিক করেছে। এদিকে ফিনান্সের পাত্তা নেই।

হ্যাঁ, ও ভীষণ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। কিন্তু এবার খুব প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে।

আসুন না, ঘরে এসে একটু বসুন। দাদা এই পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় ফেরে।

জোজো ঘড়ি দেখে বলল, এখন তো মোটে চারটে।

তাতে কি ? আমরা কি কথা বলার যোগ্যও নই ? আসুন।

জোজো ঘরে ঢুকল।

ওদের বৈঠকখানাটি বেশ সাজানো। তাদের মতো নয়। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা একটা ছবির প্রিন্ট। একটু ভুতুড়ে। কিন্তু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

তিথি উল্টোদিকের সোফায় অনেকটা দূরে বসল। বেণীটা বাঁ দিকে সামান্য টেনে এনে আঙুল দিয়ে খেলা করতে করতে বলল, দাদার জন্য আপনি খুব খাটছেন শুনলাম।

না, তেমন কিছু নয়।

আমি দাদাকে খুব ভাল চিনি। ভীষণ হেলপলেস টাইপ। একটুও স্ট্রং মাইণ্ডেড নয়।

জানি। কিন্তু বিজয় খুব ভাল ছেলে।

হ্যাঁ, খুব ভাল। ওর মধ্যে নোংরামি নেই। আপনি কি দাদার পার্টনার হবেন ?

জোজো ম্লান একটু হাসল, টাকা থাকলে হওয়া যেত।

কিন্তু শুনেছি দাদা আপনাকে পার্টনার করে নিয়েছে।

জোজো মাথা নেড়ে বলল, না। তবে সেরকমই কথা ছিল বটে। ইমোশনের মাথায় প্রথম আলাপেই আমাকে পার্টনার করে নিতে চেয়েছিল। পরে হয়তো কেউ ওকে সাবধান করে দিয়েছে যে, অচেনা লোককে বিশ্বাস করতে নেই।

তিথি লজ্জায় লাল হয়ে বলল, কই, দাদা তো সেরকম কিছু বলেনি।

জোজো তার সতেজ গম্ভীর মুখখানা তুলে বলল, আমাকে বলেছে। খুব সরল মানুষ, পেটে কথা চেপে রাখতে পারে না।

কী বলেছে ?

বলেছে ওর আত্মীয়রা এই পার্টনারশিপটা পছন্দ করছে না।

যাঃ। বলে তিথি লজ্জায় ছটফট করে উঠল, ঘামতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের ভুতুড়ে ছবিটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জোজো। তারপর ধীর স্বরে বলল, ঠিকই করেছে। হঠাৎ আবেগের মাথায় আমাকে বিশ্বাস করে বসাটা ঠিক হত না। আমি কিরকম তা তো আর ও জানে না।

তিথি খুবই ক্ষীণ স্বরে বলল, তাহলে ওর জন্য আপনি এত চেষ্টা করলেন কেন ?

একরকম বেকার বসে আছি, বিজয়টাও তেমন শক্ত ধাতের নয়। তাই একটু খেটে দিলাম। তাতে কি ?

আপনি কি একদম বেকার ? একটা চাকরি তো করেন !

করি। খুব বাজে একটা চাকরি। আগে খুব খাটতাম, এখন তেমন করে খাটি না।

একটা ভাল চাকরির চেষ্টা তো করতে পারেন।

জোজো ম্লান একটু হাসল, চেষ্টা! সে তো অনেক করেছি একসময়ে। আজকাল আর ভাল লাগে না। একটা জীবন, কোনোক্রমে কেটে যাবে।

আমি দাদাকে বলব, যাতে আপনাকে পার্টনার করে নেয়।

কেন ? আমার হয়ে বলবেন কেন ? বিজয় আমার বন্ধু। অন্য কেউ এসে ওর কাছে আমার হয়ে সুপারিশ করলে বন্ধুত্বটা আর থাকবে না। আমার তো পার্টনার হওয়ার বাসনা নেই।

আপনার হয়তো প্রয়োজনও নেই, কিন্তু প্রয়োজনটা আমার দাদারই। দাদা ভীষণ দুর্বল মনের মানুষ। ওর একজন স্ট্রং বন্ধু দরকার।

বন্ধু তো আছিই। যখন দরকার হবে আমার কাছে চলে যাবে। যা পারব করব।

আপনি কিন্তু ভীষণ উদাসীন। একটু নিষ্ঠুরও।

জোজো একটু হাসল। রবীন্দ্রনাথের ভুতুড়ে ছবিটা থেকে চোখ নেমে এল তিথির সতেজ সুন্দর মুখখানার ওপর। একটা মেয়ে। মেয়েদের কথায় আর বিশ্বাস করে না জোজো। মেয়েদের সে বিশ্বাস করে না।

মৃদু স্বরে জোজো বলল, আপনি শুধু আপনার দাদার প্রয়োজনের কথা ভাবছেন।

মোটেই না। আপনারও তো কিছু করা উচিত।

আমি কার জন্য করব ? আমার তো এত উন্নতি-টুন্নতির দরকারই মনে হয়

না।

আচ্ছা বসুন। আমি আপনার জন্য একটু চা করে আনি।

চা! না, তার দরকার নেই এখন। আমি বরং উঠি। বিজয় এলে খবরটা দিয়ে দেবেন। কাল আমি ওকে ব্যাংকে নিয়ে যাবো।

আপনি আর একটু বসুন। প্লিজ!

কেন?

আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

কী কথা?

খুব পারসোন্যাল কথা। কেউ একজন খুব অন্যায়ভাবে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু তার জন্য সব মেয়েকে দায়ী করা কি আপনার উচিত?

জোজো একটু অবাক হয়ে বলল, সব মেয়েকে কে দায়ী করেছে? আমি?

আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় মেয়েদের আপনি ঘেন্না করেন।

জোজো মাথা নেড়ে বলল, না, তা নয়। আসলে আমি আর প্রকৃতিস্থ নই। অনেক সময়ে একটা বিশ্বাসের ভিত নাড়া খেয়ে গেলে মনটা আর সেখানে বসতে চায় না।

কীভাবে প্রমাণ করব বলুন তো যে, ওই মেয়েটি যা করেছে তার জন্য আমিও লজ্জা বোধ করি!

জোজো রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আপনি যে সিমপ্যাথেটিক তা আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

তিথির চোখ ছলছল করছিল। মুখখানা করুণ। অনেকক্ষণ কথা বলল না। আঁচলে চোখ দুটো একটু মুছে নিয়ে বলল, এখনই চলে যাবেন না। একটু বসে থাকুন।

জোজো মৃদুস্বরে বলল, বসছি। আপনি বরং চা করে আনুন।

পালাবেন না তো!

না। আমি সব সময়ে পালাই না। মাঝে মাঝে পালাই। এখন পালাব না।

প্রমিস?

প্রমিস।

হালকা প্রজাপতির মতো উড়ে গেল তিথি।

রাত্রে তিথি তার দাদার ঘরে এসে ঢুকল ঝড়ের মতো।

এই দাদা, তোর মতলবটা কী রে?

বিজয় তার কাগজপত্রের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। বিরক্তির গলায় বলল, কিসের মতলব?

জোজোকে পার্টনার করবি না?

তোরাই তো বারণ করলি!

কবে বারণ করেছি?

এই মিথ্যুক, সেদিন বলেছিলি না অজ্ঞাতকুলশীল....

আর ও যে তোকে ব্যাংক লোন পাইয়ে দিল!

সে তো দিল। জোজো না হলে পেতামই না।

তাহলে? তুই কী আনগ্রেটফুল রে দাদা!

আরে, কী আশ্চর্য! তোদের কথাতেই তো আমি··

তোর নিজের বুদ্ধি নেই কেন? তুই লোক চিনিস না?

খুব চিনি। তোদের মতো ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। সেইজন্যই তো··

তাহলে আমাদের কথায় নাচলি কেন?

বাঃ, এ দেখছি উল্টো চাপ। তোর হলটা কী? জোজোর প্রেমে·

পড়ে থাকলে পড়েছি। তোর অত কথায় কাজ কী? ওকে নিবি কিনা!

ও রাজি হলে তো! দারুণ প্রেস্টিজ সেন্স।

রাজি করাতেই হবে। ওকে ছাড়তে পারবি না।

বিজয় বোনের দিকে চেয়ে বলল, সত্যি নাকি?

কী সত্যি?

ওর প্রেমে পড়েছিস?

তাতে তোর কী?

পূর্বার বিয়েটা আগে লাগাই, তারপর তো·

চুপ কর তো। এখনই বিয়ে বিয়ে কিসের? আগে দাঁড়াক।

ও বাবা, এ যে দেখছি অনেকদূর গড়িয়েছে!

মোটেই না। আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। ও কেন মেয়েদের অত ঘেন্না করবে?

ঘেন্না করে নাকি?

করেই তো।

তাহলে কী হবে তোর?

সেইটেই তো চ্যালেঞ্জ। আমি বরফ ভাঙবোই।

ওকে কে একটা মেয়ে···

জানি। সব মেয়েই তো একরকম নয়।

বিজয় একটা প্রগাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সব একরকম। এই যে আমি, আমাকে কেউ পাত্তা দিল ? অথচ···

তোর হবে না। সকলের হয় না।

যাঃ যাঃ, হয় না ! হয় কিনা এবারে দেখিয়ে দেবো। টাকা হলেই···

সবাই পায়ে এসে গড়াবে, না ? তুই সেই স্বপ্নই দেখ বসে বসে।

জোজোকে পার্টনার নেওয়ার ব্যাপারে তাহলে এগোবো ?

দরকার হলে ওর পায়ে পড়বি।

এক বছর পর একদিন

ভোর সাতটায় দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিং হোমে অন্বেষার মেয়ে হল। সাত পাউন্ড।

জোজো আর বিমল সারারাত ছিল লাউঞ্জে বসে। মেয়ে হওয়ার খবর পেয়ে দুজনেই উঠল। যাক নিশ্চিন্ত। একটি আয়া ন্যাকড়ায় জড়ানো বাচ্চাটা দেখিয়ে নিয়ে গেল, বলল, সোনার আংটি চাই।

জোজো তার স্কুটারটা স্ট্যাণ্ড থেকে নামিয়ে বলল, চল দাদা, তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না। সকালবেলায় ওই ভটভটিয়ায় চড়ে ঝাঁকুনি খেতে পারব না। তুই যা। আমি বাসে যাবো।

আরে ভয় পাচ্ছিস কেন ? স্কুটারে তো মাকে বাবাকেও চড়াই রোজ। আয়।

না, না। তুই তোর কারখানায় চলে যা। বিজয় হয়তো অস্থির হবে। আমি যেতে পারব।

জোজো স্কুটার ছেড়ে দিল। দাদাটা যা ভীতু ! মা চড়ে, বাবা চড়ে, তিথি চড়ে। ওরই যত ভয়।

রাত জাগার ক্লান্তির পর স্কুটার চড়ে ঝোড়ো বাতাস খেতে খুবই ভাল লাগছিল জোজোর। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে তার একটুও খারাপ লাগবে না। আজ তো সে চাকরির উমেদার নয়। আজ সে আর বিজয় অন্তত ত্রিশজনের লোকের অন্নদাতা ! ভাবতেই শরীরের রক্ত চনমন করে ওঠে। বিজয় গাড়ি কিনতে চায়, বাড়ি কিনতে চায়, জোজো তাকে সামলায়। এখনও অনেক পথ, অনেক ঝামেলা। এই তো সদ্য একগাদা

টাকা নেমে গেল পূর্বার বিয়েতে। চাকরি ছাড়বে না বলে দুর্গাপুরের পাত্র হাতছাড়া হল, কিন্তু কপাল ভাল মেয়েটার, সোদপুরের বর জুটে গেছে কপালে।

ব্রেকফাস্ট আজকাল বিজয়ের বাড়িতেই সারে জোজো। বকলমে শ্বশুরবাড়িতেই তো! স্কুটারটা সেই ভাবী শ্বশুরবাড়ির দিকে মোড় ফেরাল জোজো।

আর তখন ভোরবেলায় কালীকিংকর একা তাঁর পুরোনো নড়বড়ে বেঞ্চখানায় বসে পার্কের শোভা দেখছিলেন। দেখার কিছু নেই আপাতদৃষ্টিতে। সেই চেনা প্রকৃতিহীন পার্ক, সেই শহর, সেই আটাত্তর বছর ধরে দেখা সূর্যের আলো।

কিন্তু আজকাল নিত্যই নতুন রকম লাগে পৃথিবীকে। কত যেন গভীর হয়ে যায় জীবন, কত মায়া এসে যোগ হয়, কত শব্দ তরঙ্গ তোলে।

যখন বাড়ি ফিরলেন কালীকিংকর তখন রোদে একটু ঘেমে গেছেন। সুরভি পাখাটা খুলে দিয়ে বললেন, বউমার মেয়ে হয়েছে।

কালীকিংকর উজ্জ্বল হলেন, গোপুর একটা সাথী হল। বড্ড মনমরা হয়ে ছিল ছেলেটা।